

আল্কাপ



আলকাপের চিঠি

আলকাপের মুখপত্র
৭০তম সংখ্যা

ব্রতী মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

(লেখকঃ কবি ও অণুগল্পকার)

এই কি যাওয়ার সময় হল, অমল!

পাঁচমুড়া পাহাড় শ্যামলী নদী

বাঁকা বাঁকা ঝরনা মাঠের পর মাঠ সবই তোমার চেনা
মনুয়া পাখি যে ডালে লুকিয়ে সেখানেই চাঁপা হয়ে
ফোটা, এখনই!

রাজার ওই ডাক-হরকরা,

তারও কি সময়তাল নেই চিঠি বিলি করার!

সমস্ত জানলা তোমার জন্যে সবাই মিলে

সেই কবে খুলে দিয়েছিলাম

কী এমন হল রাজার ওই কবিরাজ ধরতে পারল না

এই কি যাওয়ার সময় হল, অমল,

এই ভাবে এলোমেলো সব ফেলে রেখে,

সব খেলনা সব কাজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রেখে।

এই ভাবে যেতে নেই, অমিতাভ,

এইরকম শূন্য গান ঠোঁটে

যখন আলকাপের তাকে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, সেই সময় তার এই চলে যাওয়া আলকাপ মেনে নিতে পারছে না।

এই অনভিপ্রেত ঘটনা আলকাপ তথা তার শুভানুধ্যায়ীদের বিস্ময়ে হতবাক করেছে।

একজন আবৃত্তিকার, অভিনেতা, সাংবাদিক, প্রবন্ধকার থেকে আলকাপের সুদক্ষ সংগঠক এবং সব শেষে একজন দক্ষ নাট্য পরিচালক হয়ে ওঠা জীবনের এই পরিক্রমায় সে যখন নিজেকে ভীষণভাবে সক্রিয় ও প্রস্তুত করে তুলেছিলো সেই সময় ৫৬ বছর বয়সে তার জীবনের এই যবনিকাপাত আলকাপকে এক ঘোর অমানিশায় নিমজ্জিত করলো।

কবে আমরা আবার নতুন করে ঘুরে দাঁড়াবো, আমরা জানি না।

অমিতাভ বসু অভিনীত নাটক

সাজানো বাগান, শাদুল, অমিতাক্ষর, তোতা কাহিনী, বিশ্ববন্ধু হ্যানিম্যান, বিদ্যাসাগর, জয়শ্রী অবাধ, একান্নবর্তী (শ্রুতি নাটক), কোর্ট মার্শাল, বল্লভপুরের রূপকথা, সোনার চেয়ে দামি, তোতারাম, কবর, পিউপা, গিভ এন্ড টেক, অন্যমুখ।

অমিতাভ বসু অভিনীত শর্ট ফিল্ম

ব্যাক সেজ - পরিচালনাঃ পার্থ সারথী জোয়ারদার।

অমিতাভ বসু পরিচালিত নাটক

পিউপা (২০০৪)

অন্যমুখ (২০০৬)

চডুইভাতি (২০১১)

অক্টোপাস লিমিটেড (২০১৮)

তোতাকাহিনী (নবরূপে)

ডাকঘর (২০১৫) - হিজলি সাংস্কৃতিক উৎসব উদযাপন
কমিটি, প্রান্তিক শাখা

ছায়াস্মৃতি বারে বারে ঘুরে ঘুরে আসে

দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(লেখক: আলকাপের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য)

মেদিনীপুর যাওয়ার পথে ভিড় বাসে গাদাগাদি অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক বিনীত বালকের সাথে কথোপকথন হয়েছিল বহুকাল আগে। আমাদের আপিসের নিমাইদা (মালঞ্চবাসী নিমাই সরকার, শিল্পীমন নাট্যদলের পরিচালক প্রতিষ্ঠাতা) কয়েকদিন আগেই এই বালকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তারও আগে নানা কথায় ভূমিকা করে রেখেছিলেন যার সারমর্ম হল, এই সম্ভাবনাময় ছেলেটিকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে নাও, ভাল আবৃত্তি করে, অভিনয় করতে চায়, শিল্পীমনে ওর খিদে মিটছে না। তা সেই গাদাগাদি ভিড় বাসে সাহিত্য নিয়ে কথা হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সেই সময়ে প্রকাশিত কোন লেখা নিয়েও কথা হয়েছিল। সেই কথোপকথনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়েছিল ওই বালকের শিল্পবোধ, নাট্যাগ্ৰহ। মনের মধ্যে নবীনবরণ সেদিনই হয়ে গিয়েছিল। কি যে হল, সেই নবীন সব ছেড়ে চলে গেল। ছেড়ে চলে গেল নাকি তাড়িয়ে ছাড়লাম। বুক ফেটে যায়। নিজেকে অপরাধী মনে হয়।

কোর্ট মার্শাল নাটকে সৈন্যবাহিনীর ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল অমিতাভ। প্রথমে ওপর চালাকি। কাপুরকে খুশী করে বেশ একটা আত্মপ্রসাদ। নিজের কৃতিত্বে নিজেই অভিভূত। তারপরে উকিল ক্যাপেন রায়ের জেরার সামনে নার্সিস, কাপুরের কথায় বাধ্য হয়ে রামচন্দরের বিরুদ্ধে মিথ্যে বানানো কথা বলার অভিনয়। সরকারি উকিল ক্যাপেন রায় আর মেজর কাপুরের উচ্চকিত হেঁচকয়ের মধ্যে একটু নীচু স্বরে, অভিনয়ের মধ্যে অভিনয় দিয়ে অভিনেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিল অমিতাভ।

প্রদীপদা (প্রদীপ চক্রবর্তী) বল্লভপুরের রূপকথা নাটকটি পরিচালনা করেছিলেন। সেখানে অভিনেতা হিসেবে অমিতাভর আড় ভেঙ্গেছিল। বিভিন্ন চরিত্রে অমিতাভকে কল্পনা করা যায়। সহজাত রসবোধ থাকায় কমেডিতে সফল হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু স্লাম্পিক কমেডির তুমুল শরীরী অভিনয়ও যে সম্ভব ওর পক্ষে সেটা প্রমাণ হয়েছিল প্রদীপদার দৌলতে। সেই দৃশ্যটার কথা খুব মনে পড়ে যেখানে অদৃশ্য অশরীরী আক্রমণকারীর কল্পিত আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাতে কম্পিত হাতে চেয়ারের পিঠটা ধরে চেয়ারটা তুলে নিজেকে আড়াল করে আর গোটা প্রেক্ষাগৃহ ফেটে পড়ে হাসিতে। সঞ্জীব চরিত্রের জন্য পরিস্থিতি থেকে তৈরি হওয়া হাস্যরসের সাথে শরীরী বিভঙ্গ জুড়ে একটা তুমুল অভিনয়ের আদল তৈরি করেছিলেন প্রদীপদা। মনোযোগী ছাত্রের মতো সেটা আত্মস্থ করে

নিচ্ছিল অমিতাভ, মস্তিস্ক দিয়ে নিজেকে ভাঙছিল, সহ অভিনেতা হিসেবে পাশে দাঁড়িয়ে সেটা দেখেছি। তারপর ১০/১৫ বছর ধরে শাণিত করেছে অভিনয় দক্ষতা। আর সেই সঙ্গে হয়ে উঠেছে আলকাপের দ্বিতীয় প্রজন্মের ক্ষুরধার পরিচালক।

আলকাপে আসার পর থেকে সমস্ত নাটকেই, শুধু নতুন প্রযোজনাতেই নয় পুরনো নাটকেও পরিবর্ত অভিনেতা হিসেবে ওর উপস্থিতি প্রায় অপরিহার্য ছিল। সেভাবেই সোনার চেয়ে দামী, তোতারাম, গিভ গ্যান্ড টেক, শাদুল, পন্ডিত মূর্খ ক্রীতদাস কথা, সাজানো বাগান, অমিতাক্ষর, তোতাকাহিনী, মুক্তো একটি মেয়ের নাম, বিশ্ববন্ধু হ্যানিমান, জয়শ্রী অবাধ, কবর ইত্যাদিতে চুটিয়ে অভিনয় করেছে অমিতাভ।

তারপর পরিচালক হিসেবে ওর প্রথম কাজ পিউপা। প্রথম কাজেই বাজিমাং। ওই নাটকের বর্ণময় সেট এখনও স্মৃতিতে উজ্জ্বল। আমি তখন কর্মসূত্রে কলকাতায়। নাটকটা পড়েছি। বিষয়, গল্প ভাল। কিন্তু বেশ কিছু সংলাপে অকারণ ছদ্ম কাব্য আমার পছন্দ হয় নি। কিন্তু যখন নাটক দেখলাম তখন আর এসব মনেই পড়ল না। একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। যেমন গতি, যেমন উচ্চাবচতা, তেমনি অভিনয় বিশেষ করে মূল গল্পের অংশে। একজন যথাযোগ্য নাট্য পরিচালক আলকাপে তৈরি হয়েছে ভেবে নিশ্চিত বোধ করেছিলাম।

চডুইভাতি নাটকের বেশ কয়েকবার মঞ্চায়নের পরে একদিন ঘটনাচক্রে আমি ঐ নাটকের মহলায় উপস্থিত ছিলাম। গোটা নাটকটাই যুদ্ধবিগ্রহকে, যুদ্ধপরিচালকদের, যুদ্ধ অংশগ্রহণকারীদের, যুদ্ধসমর্থকদের প্রতি ঠাট্টাবিদ্রুপে ভরা। সেটাই নাটকের চলন। অমিতাভ সেই চলনটাই নিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ করে একজায়গায় নিয়ে এলো যুদ্ধের কারুণ্য যদিও আপাতদৃষ্টিতে সংলাপে কিন্তু সেই ঠাট্টাই আছে। সৈনিকরা একঘেয়েমি কাটানোর জন্য উল বোনে। কিন্তু উল বোনা কোন কাজে লাগে না কেননা সোয়েটার রাখার কোন জায়গা নেই, সব সুটকেস ভর্তি। একজন তাই সোয়েটারের বদলে ফুল বোনে, সেই ফুল রেখে দেয় নিহত সৈনিকের বুকের ওপর। তারপর বলে, যত ফুলই বানাই কুলিয়ে উঠতে পারব না। এই বাক্যটিকে কেন্দ্র করেই অমিতাভ গড়ে তোলে এক করুণ মুহূর্ত। যে মুহূর্ত মঞ্চের আলো আঁধারি আর মগ্ন অভিনয়েই গড়ে তোলা সম্ভব যা থার্ড থিয়েটার ফর্মে গড়ে তোলা সম্ভব হোত না। থার্ড থিয়েটার প্রসঙ্গ এইজন্যে যে এই নাটক থার্ড থিয়েটার ফর্মে করার জন্যই লিখেছিলেন বাদল সরকার। কিন্তু অমিতাভর পছন্দ ছিল প্রসেনিয়াম। প্রসঙ্গতঃ বাংলার অনেক কৃতি নাট্যপরিচালক অভিনেতারা এই প্রযোজনার ভূয়সী প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন যে নাটকটা প্রসেনিয়ামে এভাবে করা সম্ভব তা ভাবতে পারেন নি তাঁরা। এই প্রযোজনার জন্য

আলকাপ আর অমিতাভকে নাট্য একাডেমির মাথারা বিশেষ করে চিনেছিলেন। তা ওই দৃশ্যটির মহলা হচ্ছিল সেদিন। অভিনেতারা দৃশ্যটি আগে তৈরি করেছে, এখন শুধু একবার মনে করে নেওয়া। কিন্তুনা, অমিতাভ একটু একটু করে, বলা যায় একচুল একচুল করে কিছু পরিবর্তন করতে চাইছিল। তাই সৈনিকের ওই সংলাপের ৩/৪ টি বাক্য এবং তার সাথে সহ অভিনেতাদের যোগ, এটারই মহলা দেওয়া হচ্ছিল টুকরো টুকরো করে, ভেঙে ভেঙে। অমিতাভ চেষ্টা করছিল একটু একটু করে বিভিন্ন অনুভব বিভিন্ন অর্থময়তার মধ্যে দিয়ে অভিনেতাদের নিয়ে যেতে। গোটা কাজটাই এমনভাবে করছিল যে অভিনেতারাও বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন কোণা থেকে আলোর আভাস পাচ্ছিল। তাই বিরক্ত হওয়ার বদলে তারাও মজে যাচ্ছিল নতুন অনুভূতির মধ্যে, নতুন সৃষ্টির আনন্দে। অভিনেতাদের সঙ্গে নিয়ে মনোলোকের নানা প্রান্তরেটুঁ মারাই ছিল অমিতাভের পরিচালন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। খুবই খুঁতখুঁতে পরিচালক ছিল সে। আমরা অনেক সময়ই এটা পারা গেলনা ওটা পারা গেলনা কিন্তুকি আর করা যাবে, ভেবে ছেড়ে দিতাম। নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা করে এগুলোকে ছাড় ১ ছাড় ২ ইত্যাদি বলে অভিহিতও করতাম। কিন্তু অমিতাভ ছাড়তে চাইত না। লক্ষ্য করেছি, ও লেগে থাকত এবং জিনিসটা ঘটিয়েই ছাড়ত।

অন্যমুখে মঞ্চসজ্জা হল একেবারেই অপ্রথাগত। মঞ্চের মাঝখান থেকে পেছনের দিকে একটা করিডোর মত জায়গা চলে গেছে। হঠাৎ দেখলে সংশয় জাগে প্রেক্ষাগৃহের সব জায়গা থেকে করিডোরের ভেতরটা দেখা যাবে তো। সেখানেই আছে ইলেকট্রিক চেয়ারে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিয়ে দেবার সুইচ আর আছে ফাঁসুড়ের বসবার চেয়ার। ওখানেই তৈরি হয় সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত যখন ফাঁসুড়ে বাবা জেনেশুনেই তার ছেলের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য ইলেকট্রিক চেয়ারের সুইচটা ঠেলে ওপরে তুলে দেয়। দৃশ্যের অভিঘাত প্রবল হয়ে ওঠে ওই করিডোর আর তার ভেতরের লালচে আলোর জন্য। আলকাপের ছোট মঞ্চের ওই করিডোরের জন্যই তৈরি হয় সঙ্কীর্ণ গভীর একটা দেশ যেখানে বীভৎসাও তার গভীরতা নিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নাটকে আসার আগেই অমিতাভ ছিল এই শহরের একজন পরিচিত আবৃত্তিকার। কিন্তু সৌভাগ্য আমাদের, অনেক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠিত আবৃত্তিকার ও তাঁদের অনুসরণকারীদের মত একটু সুরে একটু টেনে টেনে, কণ্ঠকে বিশেষ প্রচেষ্টায় সুললিত করে শব্দের একরকমের কৃত্রিম উচ্চারণ করার প্রয়াস ওর মধ্যে ছিল না। ছিল না বলেই নাটকে অমিতাভ একজন সফল শিল্পী। অবশ্য শুধু আধুনিক আবৃত্তি অনুশীলনই নয় সফল নাট্যশিল্পী হবার পেছনে ওর সাহিত্যপাঠ, শিল্পবোধ, রাজনীতি সচেতনতা, সর্বোপরি প্রবল রসবোধেরও বিশাল ভূমিকা ছিল।

খুব কম হলেও, কবিতা লিখত অমিতাভ। প্রবন্ধ যেমন

ভালোবেসে কবিতা তেমনই ভালোবেসে লিখত। কল্লোলের কবিতা, বনাঞ্চল থেকে মূলবাসীদের উচ্ছেদ করে কপোরেট কর্তৃক খনিজ লুটের চেষ্টায় ভূ-প্রকৃতিকে বংস বিষয়ে কিংবা বাদল সরকারের ওরে বিহঙ্গ-এর শতাব্দী প্রযোজনা — এই সব হচ্ছে চিন্তক ও বিশ্লেষক অমিতাভের কয়েকটি প্রবন্ধের বিষয়।

আর যে সব ঘটনা মনের ভেতরের আবেগে খুব আলোড়ন ফেলত, সেসব মথিত হতে হতে কবিতা হয়ে বেরিয়ে আসত। নন্দীগ্রাম আন্দোলন তেমন একটা ঘটনা। পক্ষাবলম্বনের অনিশ্চয়তা নিয়ে খোঁচা তেমনি আরেকটা ঘটনা। (এই সংকলনের অন্যত্র কবিতা দুটি আছে) শেষলেখা এই কবিতায় যে যুবকের কথা লিখেছে সেই যুবকের কাছ থেকেই কবিতায় উল্লিখিত প্রতিদিনের কথোপকথন শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। পক্ষ নেওয়া না নেওয়ার খানিক আন্দাজ করতে পারি। নিশ্চিন্তে সমর্পণ করা যায় এমন পক্ষ স্থির করতে না পারার যন্ত্রণা সেটা।

রাত্রে আলকাপ থেকে ফেরার পথে ভান্ডারীর মোড়ে দাঁড়িয়ে চা খেতাম দেবব্রত অমিতাভ আমি, কখনো জুটে যেত অমিয়। সুরজিত কলকাতা থেকে এলে অবশ্যই থাকত। তুমুল আড্ডা হত, পরে সেটা চলে আসে সেশনে ট্যাক্সি স্যান্ডের পাশের চায়ের দোকানে। ওই আড্ডাগুলোয় নতুন কোন বাংলা নাট্যপ্রযোজনা নিয়ে যেমন কথা হত তেমন অন্যান্য রসালাপও হত। ওই আড্ডাতেই নান্দীকারের মেঘনাদ বধ দেখার অভিজ্ঞতা বলেছিল অমিতাভ। আমার কাছে আড্ডার অন্যতম আকর্ষণ ছিল অমিতাভ আর সুরজিতের কৈশোরের নানা গল্প। বিশেষ করে মালঞ্চর কোন কোন চরিত্রকে নিয়ে অসাধারণ সব স্মৃতি। অমিতাভ আবার কারুর কারুর বলার ধরন নকল করে হাস্যের বন্যা বইয়ে দিত। দল নিয়ে কত আলোচনা হত। মহলা শেষ হওয়ার পর আলকাপ বন্ধ করে সকলের বাড়ি যাওয়ার তাড়া থাকত। তাই আড্ডার তেষ্ঠা মেটাতে ভরসা ছিল চায়ের দোকান। অমিতাভর সাথে আড্ডায় একরকম করে প্রাণের আরাম পাওয়া যেত।

অমিতাভর পরিচালনায় কয়েকদিন মহলা দেবার সুযোগ হয়েছিল। সেই কথা একটু বলি, কোন পরিচালক যদি বলেন, আপনি এই চরিত্রে অভিনয় না করলে নাটকটাই করব না, তখন সর্বশক্তি প্রয়োগ করে নিজেকে গভী থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া অভিনেতার আর কোন উপায় থাকে কি?

বহুদিন আগে বহুরূপীতে প্রকাশের সাথে সাথেই মোহনলাল স্বর্ণকার নাটকটি আলকাপ প্রযোজনা করার কথা ভেবেছিল। এমনকি মোহনলালের শরীর ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাওয়া কিভাবে দেখানো যাবে সেটা অব্দি আলোচনা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর মহলায় ফেলা হয়নি।

তবে প্রায়ই নানা প্রসঙ্গে আলাপ আলোচনা আড্ডায় এই নাটকটির কথা উঠত। ২০১৩/১৪ নাগাদ কামদুনির ঘটনা

ঘটটার পর সংবাদ মাধ্যমে ধর্ষণের সংবাদ নিয়ে প্রচুর আলোচনা হচ্ছিল। একদিন অমিতাভর সঙ্গে আড্ডা মারার সময় মোহনলালের কথা ওঠে। ততদিনে কয়েকটা একাঙ্ক নাটক পরিচালনা করে ফেলেছে অমিতাভ। ওকে মোহনলাল করার কথা ভেবে দেখতে বলি। এই নাটক খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে তখন। ওই সময় প্রবীণরা অনিয়মিত, যতদূর জানতাম আলকাপের অবস্থা, তখন অমিতাভই ওই নাটক পরিচালনা করার জন্য ঠিক যোগ্যতম ব্যক্তি।

অমিতাভ তখন পাল্টা প্রস্তাব দেয়, আমি মোহনলালের দায়িত্ব নিতে পারি যদি আপনি মোহনলালের অভিনয় করেন। বোধহয় বছর কুড়ি-পঁচিশ ধরে এই নাটকটা আমাদের মাথায় ছিল। তাছাড়া সেই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে, আমাদের সম্ভাব্য দর্শকদের মধ্যে ধর্ষণ ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। কে দায়ী, এই প্রশ্নের মুখ নিজেদের দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য এই নাটকটা ছিল মোক্ষম অস্ত্র। আলকাপে আমার যাওয়া তখন অনিয়মিত হলেও অমিতাভর প্রস্তাবে রাজি না হয়ে আমার কোন উপায় ছিল না।

খুব উত্তেজিত ছিলাম এই নাটকটা নিয়ে। বসে মহলা হয়েছিল বড়োজোর ৫-৬ দিন। প্রথম যেদিন বসে আমার জায়গাটা পড়ি, একেবারে শিক্ষার্থীর মত অনুভূতির চূড়ার দিকে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিলাম। খুবই চিন্তায় পড়েছিলাম অমিতাভ যে আস্তা রেখেছে তার অমর্যাদা হচ্ছে কিনা। কিন্তু অমিতাভর চোখ দেখে মনে হয়েছিল, হয়ত খুব বেশি নিরাশ হয়নি। শুধু যে আমিই অমিতাভর চোখে নিশ্চয়তা খুঁজেছি তা নয়, স্পষ্ট বুঝলাম অমিতাভও আমাকে আশ্বস্ত করতে চাইল। সেদিন পরিচালক হিসেবে অমিতাভর ওপরে দ্বিধাহীন চিন্তে আস্তা রাখতে পেরেছিলাম। সব পরিচালকের ক্ষেত্রে এটা হয় না।

বড়বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম নাটকটা নিয়ে। মহলার আগেই অনেক তথ্য যোগাড় হয়েছিল। অমিতাভ তখন ইন্টারনেট ব্যবহারে ততটা সড়গড় ছিল না। আমার বাড়িতে নেট ছিল তাই স্বাভাবিক ভাবেই আমার ওপর কিছু দায়িত্ব এসে পড়েছিল। আমাদের মনে হয়েছিল, মোহনলালের তথাকথিত অস্বাভাবিক আচরণ নিশ্চিতভাবে কোন রোগের লক্ষণ যা নাট্যকার ব্যবহার করছেন। পরে দেখা গিয়েছিল আমাদের ধারণা ঠিক। প্রথমে তো জিনিসটা নেটে খুঁজব কী করে তাই বুঝতে পারছিলাম না। শেষে এক ডাক্তারের (ডাঃ দীপা চক্রবর্তী) সাহায্য নিয়ে খানিক আন্দাজ করা গেল। তারপর কিছু খোঁজা-খুঁজি করতেই নানা ডিস-অর্ডারের সন্ধান পাওয়া গেল। সেখান থেকেই এই রোগটি চিহ্নিত করা গেল। পি. টি. এস. ডি. (পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার)। সবে তখন একটি ইমেল আইডি তৈরি করেছে অমিতাভ। সেখানে পঠানো হল নেট থেকে পাওয়া এই ধরনের সব ডিসঅর্ডারের তথ্য। ফোনে আলোচনা করে স্থির করা গেল, মোহনলালের কোন রোগ হয়েছে। সেই রোগের লক্ষণগুলো

বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখে অন্য জায়গা থেকে মিলিয়ে নিয়ে নিশ্চিত হয়ে, সেই লক্ষণগুলো মনে রেখে অভিনয়ের ধরন ঠিক করার চেষ্টা করছিলাম আমরা। অভিনেতা হিসাবে এই খোঁজা-খুঁজির সমস্ত পর্যায় জুড়েই অমিতাভ উস্কে দিয়েছে আমাকে। একদিন মহলায় আমার অভিনয় দেখে একজন বললেন ভয়টা বেশি লাগছে। যদিও ততদিনে জেনেছি ভয় একটা প্রধান বিষয় এই রোগের, - - - আরও একবার ঘটনা ঘটে যাবার ভয়, আরও একবার নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যাওয়ার ভয়, তবু একটু চিন্তিত হয়েছিলাম। বাড়ি যাবার পথে আলাদা করে অমিতাভ বলেছিল, আপনি ঠিক করেছেন, অন্যকিছু ভাবার দরকার নেই। আমি স্পষ্ট বুঝলাম আমার অনুভূতির তীব্রতা কমুক সেটা ও চাইছে না আর সেই সঙ্গে পরিচালক হিসেবে অভিনেতাকে আগলে রাখার দায়িত্বটা নির্ধারসাথে পালন করছে সে।

মনে আছে, সংলাপে কামারশালের হাপরের প্রসঙ্গ থাকায় বিলুপ্তপ্রায় হাতে টানা হাপর অমিতাভকে খাজরায় নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে এনেছিলাম।

সত্যকাম উপন্যাসের উল্লেখ থাকায় সেই উপন্যাস আনা হয়েছিল। শাস্ত্র পড়তে বলেছিল অমিতাভ। বাংলার সোনার বেনেদের নিয়ে তথ্য যোগাড় করতে দেখেছিলাম বাংলার নিজের স্বর্ণকাররা ছাড়াও সম্ভবত গুজরাট থেকে স্বর্ণকার পরিবার এসে এখানে বাঙালী হয়ে গিয়েছে। অমিতাভর ইচ্ছেতে গীতার কোন অংশ বাজতে পারে আবহে তাও খুঁজেছি। রঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে মাতৃ জুয়েলারিতে বসে থেকেছি সোনা কি করে গলাচ্ছে, কি করে কাজ হচ্ছে দেখার জন্য। একদিন নয়, কয়েকদিন গেছি। ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকেছি দোকানের মালিক কালীবাবুর সাথে কথা বলার জন্য। উনি আরেকটি ছোট উপন্যাসের কথা বলেছিলেন। সেই বইও আনানো হয়।

এইসব খোঁজাখুঁজি থেকেই, বিশেষত রোগটা সম্পর্কে জানতে গিয়ে আর গীতার প্রাসঙ্গিক অংশ খুঁজতে গিয়ে পেয়েছি কাব্যের আভা। অযোগ্য হাতে পড়ে সেগুলো দাঁড়ায় নি ঠিকই কিন্তু অকবির কলমেও কবিতার ইঙ্গিত যেন অধরা মাধুরী হয়ে জেগে উঠেছে। (এখানে অমিতাভকে উৎসর্গ করে একটি টুকরো রাখছি)।

পাপ

কোথাও হয়েছে পাপ

তারই অশেষ ছায়া পড়েছে ভুবনে আমার

ছায়াস্মৃতি বারে বারে ঘুরে ঘুরে এসে

স্থির হয়ে থাকে

আগুনের ফুলকি ছড়াও

পুড়ে যাক ছায়া

তারপর দন্ধ ছায়া ফেলে দাও জলে

গলিত তরলে।

কেবল তথ্য সংগ্রহ নয় অমিতাভর উৎসাহে সংলাপ বারংবার পড়ে ভাগ করেছি। পেন্সিল দিয়ে দাগিয়েছি, পার্টের খাতায় নোট নিয়েছি। নিজের প্রশ্ন, নিজের ভাবনা সেই সঙ্গে পরিচালক অমিতাভর ইঙ্গিত টুকে রাখার চেষ্টা করেছি। মহলা তো হয় নি বলা যায়, বসে বসে যে যার পার্ট বলেছি ৫-৬ দিন, তারপরেই দাঁড়িয়ে রিহাসাল, সেও হয়েছে মেরেকেটে ৩-৪ দিন বা হয়ত আরো কম। কোনদিনই ২ ঘণ্টার বেশি নয়, অমিতাভর সাথে কথা হয়েছিল, যেদিন যেদিন অমিতাভ আসবে না সেদিন সেদিন নাটকটাকে কেন্দ্র করে অভিনয় বিষয়ে আলোচনা করব। যদি অভিনয় ব্যাপারে কিছু শিখে থাকি সেগুলো ছেলেমেয়েদের কাছে রাখব। ভেবেছিলাম নাটক তো (অভিনয়ের কথা বলছি না) ছেড়েই দিয়েছি, তবু অমিতাভর পাশ্চাত্য পড়ে যখন আবার এসে জুটেছি, আমার অভিজ্ঞতা অন্যদের বিবেচনার জন্য রাখব।

নাটকের একটা কাঠামো দাঁড়িয়ে গেলে তারপর সুস্পষ্ট কাজ শুরু করতে পারেন পরিচালক।

সুস্পষ্ট কাজেই অমিতাভর দক্ষতা বেশি। আমি নিশ্চিত আরও কিছুদিন মহলা চললে আমার পার্টের খাতা অমিতাভর দেওয়া নানান নোটে ভরে যেত, ভরে যেত ডাইরির পাতাও নব নব আবিষ্কারে। এই আবিষ্কার অবশ্য মানুষের রহস্যময় মনোজগতের ভেতরে থাকা বিবেক আর রিরংসার দ্বৈরথে তৈরি হওয়া গলিঘুঁজির নানারূপ রসগন্ধের আবিষ্কার।

পক্ষে/বিপক্ষে নাটকের মহলা নিয়ে আলকাপের শুরু। সেই নাটকের জন্যও কাগজে আঁকিবুکی কাটতাম। দিনের অনেকটা সময় বিভোর হয়ে থাকতাম। অফিসে গিয়েও কাগজে দাগ টেনেই যেতাম। মোহনলাল হয়ে বিভোর হয়ে থাকাটা সেই অভিজ্ঞতার সাথেই তুলনীয়। অমিতাভ পরিচালক হিসেবে সেই আবহাওয়াটা তৈরি করতে পেরেছিল। ধরে নিয়েছিলাম এটাই শেষ নাটক তাই চেটেপুটে খেয়ে নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বিধি বাম। হল না। আরও একটা আক্ষেপ আমার রয়ে যাবে।

অমিতাভ যখনই পুরানো দিনের কথা লিখেছে, বিশেষ করে, নাটকের পুরানো দিনের কথা, নাটকের মানুষের কথা, তখনই আমাদের স্বাদুতম গদ্য পাঠের অভিজ্ঞতা হয়েছে। সোনায় বাঁধানো আর মায়ায় ভরা ওর কলমে আলকাপের চিঠিতে লেখা স্মৃতিচারণগুলো পড়লে আমার কথার যথার্থ প্রমাণ হবে। আমাদের একেক জন মানুষ চলে গেছে, তাঁদের নিয়ে অমিতাভ লিখেছে। কি মায়ার চোখে, কি শ্রদ্ধার চোখে, কি ভালোবেসে লিখেছে সে। খুব লোভ হত। গত ৩-৪ বছর ধরেই ভেবেছি, বিশেষতঃ দেবল চলে যাওয়ার পর, অমিতাভকে বলব আমি মারা গিয়েছি ধরে নিয়ে একটি স্মৃতিচারণ কর। মারা যাওয়ার আগে সেটা পড়ে যাই। মনে মনে ভাবতাম, আমি মারা গেলে ফেসবুকে অন্তত লিখবে একটা দুটো কথা। ওর ওই মায়াবী গদ্যেই লিখবে। সেটা পড়তে পারলে বড় ভাল লাগত। শুধু গদ্যের জন্য নয়, গদ্য তো আছেই, তা ছাড়াও মমত্বের সাথে অগ্রজ প্রবীণদের

গুণাবলী খুঁজে খুঁজে বার করার ঝোঁক ওর লেখায় ফুটে উঠত, সেটা নিজের ক্ষেত্রে কি হয় মারা যাবার পর তা তো পড়ার সুযোগ পাবনা। তাই ইচ্ছে ছিল ও আমার স্মৃতিচারণ করুক আমার মৃত্যুর আগেই, আমি মরে গেছি ধরে নিয়ে। কিন্তু সংকোচবশত বলতে পারিনি। অপেক্ষা করছিলাম কোন অনুকূল সময়ের। সে সময় আর এলোনা। অস্বাভাবিক ভাবে উল্টে গেল সময়। না হয় ওর কলমে নাই বা হোত আমার স্মৃতিচারণ, না হয় স্মৃতিচারণ হলেও নাই বা পড়তে পারতাম সেটা, তাই বলে আমার আগে চলে যাবে? কত ছোট আমার চেয়ে। যখন যেতাম আলকাপে মাঝে মাঝে কুমার অমিতাভ বলে হাঁক পেড়ে বড় সুখ হত। সেই সুখের দিন চলে গেল।

আলকাপের বিরাট ক্ষতি হল, আমাদের এই শহরেরও ক্ষতি হল। শহরের সংস্কৃতি চর্চা, রাজনৈতিক চর্চার ক্ষতি হল। ওর সাথে রাজনৈতিক মতানৈক্য সত্ত্বেও আমারও বড় ব্যক্তিগত ক্ষতি হয়ে গেল।

অমিতাভর কবিতার কথা উল্লেখ করেছি লেখাটাতে। তার দুটি কবিতা নীচে দিলাম।

রোজ সকালে এক যুবকের সাথে দেখা হয়।

অতীতের দহন ক্ষত তার মনে এখনো দগদগে।

এখন আস্থা রেখেছে সে নতুন দেবতায়

সকলের সমালোচনা করে কোথায় পৌঁছাবেন

আপনারা

বলে সে,

বেছে নিন কোন পক্ষ

পক্ষে ত যেতেই হয় কোন পক্ষে

কোথায় যাবেন

বেছে নিন

নয়ত রাস্তা ছাড়ুন

এই বলে জয় বজার মত রুমাল উড়িয়ে

চলে যায় অশ্বক্ষুরে আবছা করে

চারদিক

বেছে নেওয়ার অনন্ত জটাজালে

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সমকাল।

অন্নদাস

কেন তুমি গিয়েছ মিছিলে

কেন তুমি মিলিয়েছ স্বর

প্রতিবাদে

কেন তুমি তুলেছ তজনী

কেন তুমি জড়িয়েছ

নিজেকে বিবাদে

তুমি কি জানো না কারা প্রতিক্রিয়াশীল

দুবিঘার পরিবর্তে না হয় বিশ্ব নিখিল

দিয়ে দেওয়া যাবে

তোমারও তো দশ আগুলে দুধ ঘি

আমরাই জুগিয়েছি, হে অন্নদাস

কি করে এখন ছাড় পাবে?

লালু ছিল আমাদেরই একজন

ব্যোমকেশ নন্দ

(লেখকঃ আলকাপ-এর সদস্য)

চলে গেল আলকাপের এক সৈনিক অমিতাভ বসু ওরফে লালু নামে যে শৈশব ও কৈশোরের পরিচিত মুখ। বয়সে ছোট তাই এত তাড়াতাড়ি আমরা হারাণে ভাবলে কষ্ট হয়। পরিচয় আলকাপে হলেও খড়্গপুরে ওর প্রথম পরিচয় আবৃত্তিকার। বাংলা ভাষায় ওর দক্ষতা ছিল অপারিসীম। যে কোন বিষয়ের ওপর লেখা খুব আকর্ষণীয়। বহু বুদ্ধিজীবী ও গুণীজনদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত। বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা এক কথায় বাচনভঙ্গী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওর লেখাপাঠ এক সুখকর অভিজ্ঞতা, উপস্থিত বুদ্ধিও তারিফ করার মতো। তার জীবন ছিল নানান প্রতিকূলতায় পূর্ণ। বড়ই শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষানুরাগী ছিল। জ্ঞান ক্ষুধা ছিল অভাবনীয়। এই জন্য তার কবিত্বভাব প্রকাশ দৃষ্টান্ত স্বরূপ। একবার সাথী হয়ে মেদিনীপুর -এ এক কবির বাড়ী দীর্ঘ আলাপ আলোচনা আমাকে তৃপ্ত করেছিল। কৈশোরে কিছু সময় বামপন্থী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পৌরসভা নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিল। তখন সে মালঞ্চ এলাকায় লালু নামেই অধিক পরিচিত ছিল। একবার কোনো কারণে মালঞ্চের বাড়ী যেতে হয়েছিল। বহু বছর আগে তার মায়ের সঙ্গে আলাপ আমায় মুগ্ধ করেছিল। মায়ের শেষ বয়সে নার্সিংহোমে দেখা করতে গেলে কেবল কথায় কথায় লালু / লালু বলে হাল্হাশ করতেন। ছেলের প্রতি মায়ের ভালোবাসার দৃষ্টান্ত।

খেতে খুব ভালবাসত। যাকে বলে খাদ্যরসিক। সুগার থাকা সত্ত্বেও ও খাবারের সময় সংযম এর অভাব ছিল। রসিয়ে রসিয়ে খেতে খুব ভালবাসত। খাবার সময় বাকীদের পেছনে লাগার ঘটনা বেশ মজার। শেষের দিকে বলতে শুনেছি আমি তো এখন পেটরোগা। ফলে দর্শনেন্দ্রিয় যতটা খায় উদর ততটা পারে না।

আলকাপের কমিটিতে থাকার সুবাদে লক্ষ্য করেছি কোনোও বিষয়ের আলোচনার গভীরে গিয়ে তার সমস্যার কথা ও সমাধানের পথ তারই মস্তিস্ক প্রসূত।

বহু নাটকে অভিনয় করে সে দর্শকের মনে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। নাটক পরিচালনার ক্ষেত্রেও তার অবদান প্রশংসার দাবী রাখে। তার মনের মত অভিনয় চরিত্রে প্রকাশ না হলে একই দৃশ্য বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিভাবে নাটকের মান উঁচুতে পৌঁছায় তার জন্য বহুশ্রম ও সময় ব্যয় করতে দেখেছি। এককথায় পরিচালনা ও অভিনয় উভয় ক্ষেত্রেই অপারিসীম দক্ষতা ছিল যা প্রশংসনীয়।

বেশ কয়েকবার ওর পরিচালনা ও অভিনয়ের কলশোতে গিয়ে নিয়মানুবর্তিতা ও সংযম উভয়ের শিক্ষা পেয়েছি।

পাশাপাশি প্রত্যেক অভিনেতা / অভিনেত্রীর সঙ্গে ঠাট্টা মস্করা বা পেছনে পড়ার মত অভিজ্ঞতার ঘটনাও বেশ আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করত।

পরিশেষে তার অমর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। পরিবারের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা, তার প্রেরণা হোক আমাদের কাছে অক্ষয় অমর।

অকাল প্রয়াণ

অমিয় ভট্টাচার্য

(লেখকঃ আলকাপের সদস্য)

অমিতাভ চলে গেল। অমিতাভ আলকাপের নাট্য নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই নির্মাণ শিল্পে অবশ্য দালালির অর্থ নেই। কাটমানিও নেই। বরং অনেকে বলে এটা কোনও কাজ নয়, অনেকটা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। তবে এই অকাজ করা লোকটা যখন অকালে চলে গেল, তখন কত লোক যে শেষ বিদায় জানানোর জন্য আলকাপের মহলাকক্ষে এল। খড়্গপুরের প্রায় সব প্রান্তের লোক সেখানে ছিল। এমনকি মেদিনীপুর থেকেও কেউ কেউ এসেছিলেন। ছিলেন মালঞ্চর প্লুতস্বরের কৌশিক ও অন্যান্যরা। মানবাধিকার কর্মী মেদিনীপুরের দীপক বসু। বিজ্ঞান মঞ্চের কর্মীরা। সস্ত্রীক অনেক শুভানুধ্যায়ী সদস্য। অনুসরণের সোমা। সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ের অমিতাভের সহ-শিক্ষক। আর ছিলেন স্বজন হারানোর শোক বুকে নিয়ে আলকাপের সদস্যরা।

তবে সবার অপেক্ষাই সার হল। শেষ কার্টেন কল হল না। মহলাকক্ষে শেষবারের মত পরিচালক নাট্যকর্মীদের নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হলেন না। রাজু, চিরঞ্জিত, তপ, টিউ তাদের অন্তরের শ্রদ্ধায় যে শেষশয্যা রচনা করেছিল তা অস্বীকার করে অমিতাভ প্রেমবাজারের দিকে পাড়ি দিল। এ যেন চায়ের পেয়ালা আর ঠোঁটের ফাঁক গলে দক্ষ অভিনেতার মত জীবনের নাট্য মঞ্চ থেকে পলায়ন। তবে পালিয়ে গেলেই কি সব শেষ। আমাদের এতদিনের ঘর সংসার, নিত্য আনাগোনা তাতো আর সহজে ভোলবার নয়।

জীবন কি সত্যিই পদ্মপাতার জলের মত টলমল। তা নইলে যে অমিতাভকে এই সেদিন খড়্গপুর কলেজে আমার পেছনের বেঞ্চে পরীক্ষা দিতে দেখলাম। সে কাল দাঁউ দাঁউ চিতায় শেষ। যতদূর মনে পড়ছে সেই মে'ডের শতবর্ষ উদযাপনের সময় অমিতাভের সঙ্গে আলকাপের যোগাযোগ। সালটা ১৯৮৬। আলকাপ সিদ্ধান্ত নেয় খড়্গপুরের বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে শ্রমজীবী মানুষের গান, তাদের উপর লেখা

কবিতা, নাটকের অংশবিশেষ পাঠ ইত্যাদি সহযোগে শতবর্ষ পালন করা হবে। খড়্গপুরের বেশ কিছু সাংস্কৃতিক সংগঠন আলকাপের সঙ্গে যোগ দেয়। মালঞ্চর একটি সংগঠন অন্যপৃথিবী যার সঙ্গে সুরজিতদা, অমিতাভ যুক্ত ছিল তারাও আমাদের পথ পরিক্রমায় অংশ নেয়। তবে এর কিছু আগে মেদিনীপুর কলেজে মেদিনীপুর জেলা নাট্য সমন্বয় মঞ্চের সম্মেলন হয়। অমিতাভ এই মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আলকাপও এই মঞ্চে সামিল হয়।

এইভাবে অমিতাভর সঙ্গে আলকাপের যোগাযোগ গড়ে উঠে। উদয়নদার লেখা বিশ্ববন্ধু হ্যানিম্যান নাটকে অমিতাভ প্রথম আলকাপে অভিনয় করে। আলকাপে নাটকের সঙ্গে আবৃত্তি ও গানের চর্চাও হত। আবৃত্তির ক্ষেত্রে সুদীপদা, অমিতাভ এবং গানের ক্ষেত্রে বাপীদা ও অরুণদা দায়িত্বে ছিল। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আবৃত্তি করার ক্ষেত্রে অমিতাভ আমাদের বলেছিল আবৃত্তির মধ্যে যে অন্তর্লীন নাটকীয়তা রয়েছে তাকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে। আর এই বিষয়টা মাথার মধ্যে থাকলে শ্রোতার কাছে পৌঁছানো সহজ হবে।

প্রথমে অভিনয় তারপর কার্য নির্বাহী সমিতির সদস্য, সম্পাদকের দায়িত্ব, বাইরে নাটক করতে গেলে টিম ম্যানেজারের দায়িত্ব এইসব কাজগুলো অমিতাভ সুষ্ঠুভাবে পালন করেছিল। আলকাপের মুখপত্র ‘আলকাপের চিঠি’-র সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেবদাসদার পর অমিতাভর উপর এসে পড়েছিল। এই চিঠির জন্য লেখাসংগ্রহ, প্রেসে যাওয়া, কোন প্রেস কাজটা কম পয়সায় করতে পারবে তার খোঁজ করা, প্রফ দেখা ——— দলের এইসব কাজগুলো অমিতাভ দক্ষতার সঙ্গে করে আসছিল। এছাড়া দলের বার্ষিক প্রতিবেদন লেখা, ‘আলকাপের চিঠি’-র বিশেষ অংশ ‘আমাদের কথা’ এইসব কাজগুলো অমিতাভ করত। পাঠকের কথায় আলকাপের চিঠি খড়্গপুরের সময়ের দলিল হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। অনেক পাঠকই এই চিঠিকে সংগ্রহযোগ্য বিষয় বলে মনে করে।

অমিতাভ আলকাপে যে কাজগুলো করেছিল তার মূল্যায়ন করার ক্ষমতা বা সাহস কোনটাই আমার নেই। এই দায়িত্বের জন্য উপযুক্ত লোক দেবদাসদা বা সুব্রতদা। আর পারবে যে সমস্ত কুশীলবরা অমিতাভ পরিচালিত নাটকে অভিনয় করেছে তাদের পারস্পরিক আলাপচারিতা। দলে অভিনেতা পাওয়া যায়, স্পট ধরার লোকও জোটে। বর্তমান সময় দলের এই সমস্ত নাট্যকর্মীদের শ্রম, নাটক করার ঐকান্তিক ইচ্ছাকে বিন্দুমাত্র খাটো না করে বলা যায় নাট্য পরিচালনা করা বা সেই কাজে যোগ্য মানুষের বড়ই অভাব। অমিতাভ পরিচালকের এই দুরূহ কাজটাই দক্ষতার সঙ্গে

পালন করে আসছিল। স্টিপ-নাটককে কিছুটা এগিয়ে দেয়, বুদ্ধিমান অভিনেতা তাতে আরও কিছু মাত্রা যোগ করে। কিন্তু তারপরেও যে সুস্বল্প ব্যাপারগুলো থাকে তা পরিচালককে মাথা খাটিয়ে বার করতে হয়। নাটক মঞ্চস্থ হবার অনেক আগেই পরিচালক তা তার কল্পনায় অনেকবার নির্মাণ করেন। তার মনের মধ্যে চলে নাটকের চরিত্রগুলোকে নিয়ে অন্তহীন ভাঙাগড়া, সবশেষে আসে অভিনয়, মঞ্চসজ্জা, আবহসঙ্গীত সবকিছুর মাধ্যমে তা বাস্তব রূপ পায়। আর এর পিছনেও পরিচালকের ভাবনা থাকে। তাই অমিতাভের এই হঠাৎ চলে যাওয়ায় আলকাপের যথেষ্ট ক্ষতি হল। আমরাও আমাদের দীর্ঘদিনের এক সহকর্মী ও নিকট আত্মীয়সম এক বন্ধুকে হারালাম।

অমিতাভর সঙ্গে আমার তুই তুকারি সম্পর্ক। কলেজে পড়ার সময় থেকেই একটা যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল। এই ধরনের বন্ধু বিচ্ছেদ বড় খারাপ লাগে। এখন পিছন থেকে কেউ বলে উঠবে না, অমিয় একটা সিগারেট হবে? আমিও বলে উঠব না, এইভাবে আর কতকাল চালাবি? মুখে এই কথা বললেও অমিতাভ আসবে জানলে দু-তিনটে সিগারেট পকেটে নিয়ে আলকাপে ঢুকতাম। ও এটা জানত বলেই চাইত। ছেলে I.I.T. ক্যাম্পাসে পড়তে এলে ফোন করে অমিতাভকে ডাকতাম। কাজ না থাকলে ও Staff Club-এর সামনে চলে আসত। চা-পান ও কথাবার্তা চলত। ও বলত, নতুন ছেলেরা আসছে একটু সময় দে। তোর সমস্যা আমি বুঝি। দু-একটা ছোট চরিত্রে-তোকে ভেবে রেখেছি। এই তো সেদিন হিজলি স্কুলে ছেলের W.B জয়েন্ট। ছেলেকে ছেড়ে বাড়ি আসার কথা ছিল। অমিতাভর সঙ্গে দেখা পুরো সময়টা আড্ডা দিয়ে কেটে গেল। Staff Club-এর সামনে রঞ্জিতদা ছিল। বাইক রেখে দশ পা হেঁটে আসতে ওর কষ্ট হচ্ছিল। আমাদের পাশে বসে হাঁপাচ্ছিল।

শরীর খারাপের কথা হল। আমাকে সুগারে কিভাবে সতর্ক থাকতে হবে সে কথাও বলল। বেশীক্ষণ বসল না। এরপর আলকাপের নাট্যউৎসব, নন্দর ছেলের বিয়ে। অমিতাভ হাসপাতালে ভর্তি। তারপর সব শেষ। বইমেলা, Staff Club, আলকাপ অমিতাভকে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। ৪ঠা মার্চ হিজলির শ্মশানে এক অন্ধকারে রাত্রে আগুনের শিখার কুন্ডলী পাকানো খোঁয়ায় অমিতাভ এই পৃথিবীর বুকে হারিয়ে গেল। অমিতাভ এখন শুধুই স্মৃতি, নীরব স্মৃতি। আলকাপের বন্ধুজনের সঙ্গে আলাপচরিতায় কখনও কখনও তা আবার হয়ত সরব হয়ে উঠতে পারে।

অমিতাভদা

মান্ত কুমার ঘোষ

লেখকঃ আলকাপের সদস্য)

অমিতাভদা আপনি এইভাবে চলে যাবেন আমরা কেউ ভাবতে পারিনি। ট্যাংরা হাটে যাওয়ার পথে আর দেখা হবেনা আপনার সাথে। স্কুল থেকে ফেরার পথে যতো ক্লান্তি থাকুক ঠিক দাঁড়িয়ে আমার সাথে কথা বলতেন আর আমার কষ্টের কথা অনুভব করতেন। বহুবার টাকা ধার দিয়েছেন। সময় মত দিতে পারিনি, কিন্তু আপনি রাগ তো করেননি, উল্লে বলেছেন, আমি কি চেয়েছি তোমার থেকে, যবে হবে দেবে। বহু স্মৃতি আমাকে ব্যথিত করে। একবার মহলা কক্ষে রাজার সিংহাসনে বসে ব্যঙ্গ করেছিলাম তখন আপনি নতজানু হয়ে ঠাট্টা করে আমায় প্রণাম করলেন।

অমিতাভদা প্রথম শিক্ষকতা শুরু করেছিলেন সেক্রেট হাট স্কুলে, সেই সময় একদিন সকালে সেরা শে ডিয়ামের সামনে আমার সাথে দেখা। দাদা সাইকেলে স্কুলে যাচ্ছিলেন। আমার সাথে দেখা হতেই সাইকেল থেকে নেমে আমাকে প্রণাম করলেন, তোমাকে আলকাপে দেখেছি না কয়েকদিন আগে? আমিও একই প্রণাম করলাম, দুজনেই হেসে উঠলাম। এবার আমি যাই। পরে কথা হবে। স্কুলের সময় হচ্ছে।

এমনি অনেক স্মৃতি মনে পড়ছে। আমি এই প্রথম আলকাপের চিঠির জন্য কলম ধরলাম।

যেবার আমার হাতে মার লেগেছিল, আপনি স্কুল থেকে সোজা আমার বাড়ি এসেছিলেন, আমাকে দেখতে।

বৌদিকে বলে এসেছিলেন, ভাত বাড়ো, আমি মান্নুকে দেখে আসছি।

আরো অনেক কথা মনে পড়ছে। বারবার বলতে ইচ্ছা করছে...

বলতে পারো কোথায় যাবো ?

গেলে তোমায় দেখতে পারো ?

প্রণাম অমিতাভদা

চন্দ্রম্পর্শা ভট্টাচার্য্য

(লেখিকাঃ আলকাপ-এর সদস্যা)

নক্ষত্রের জন্ম হয়,
মহাকালের কাছে
তার কতটুকুই বা মূল্য ।
পৃথিবীর বুকে তাই-ই মাহেন্দ্রক্ষণ ।
নক্ষত্রের মৃত্যু
মহাকাশ তার খোঁজ রাখেনা ।
মানব জীবনে তার-ই গভীর ছায়া ।
তারারা আসে, তারারা যায়,
আলোক ছড়িয়ে মিলিয়ে যায়
কোথা হতে আসে, কোথায় যায়
কে তার খোঁজ রাখে ।
সময়ের স্রোতে ঝাঁকে ঝাঁকে নক্ষত্র বিলীন হয়
কৃষ্ণগহ্বরে ।
শুকতারা কিন্তু জেগেই রয় ।
ধ্রুবতারা, কালপুরুষ, সপ্তর্ষি বেঁচে রয়
মহাকাল হয়ে ।
পথ দেখায় দিকভ্রান্তকে
ঘটায় পার্থিব'র সাথে অপার্থিব'র মিলন
ইন্দ্রপতন, নক্ষত্রের খসে পড়া
কোনটাই তুমি নও ।
তুমি বেঁচে রবে শুকতারা হয়ে,
বেঁচে রবে ধ্রুব সত্য হয়ে ।
তোমার-ই কোন ফেলে যাওয়া পথে,
হাঁটতে হবে যখন,
তোমার দেখান দর্শন বোধ,
সত্যের খোঁজ দেবে যখন,
বারে বারে তুমি বেঁচে রবে
মৃত্যুহীন প্রাণ হয়ে ।

বিগত বেশ কয়েক বছরে আলকাপের চিঠি-র একাধিক
স্মরণ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটিতে
আমিও কলম ধরেছি কিন্তু এই স্মরণ সংখ্যা যে
অমিতাভদাকে নিয়ে এবং আমি যে এই লেখায় তাঁকেই
স্মরণ করছি তা আমার কাছে অবিশ্বাস্য । গত পনের
বছরে আমি যে ভাবে অমিতাভদাকে দেখেছি তার
ভিত্তিতে শুরু থেকে শেষ সময়টাকে দুটি ভিন্ন ভিন্ন
অধ্যায় বা পর্বে ভাগ করা যায় । প্রথম অধ্যায়, যেদিন
আলকাপে প্রথম আমি তাঁকে দেখি এবং পরবর্তী দশ

বছরেরও বেশি সময় তাঁকে যেভাবে দেখি। প্রথম বছর খানেকের মধ্যেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম আলকাপের সিনিয়র-জুনিয়র নির্বিশেষে সকলের মনেই এক স্নেহমিশ্রিত শ্রদ্ধা এবং নিখাদ শ্রদ্ধার আসন আছে অমিতাভদার প্রতি। যত দিন অতিবাহিত হয়েছে ততই নিজের মত করে অমিতাভদার প্রতি পূর্ব এবং পরবর্তী প্রজন্মের আস্থা এবং শ্রদ্ধার কারণ অনুধাবন করতে শুরু করি এবং নিজেও ক্রমে ক্রমে সেই দলভুক্ত হয়ে পড়ি। অভিনেতা-পরিচালক-শিক্ষক এই তিন ভূমিকাতেই তাঁর অসামান্য মেধার পরিচয় যত পেয়েছি ততই অমিতাভদার প্রতি এক ধরনের মুগ্ধতা তৈরী হয়েছে। তবে এ কথা ঠিক অমিতাভদাকে আমি বেশ ভয়-ই পেতাম। মনে হত তিনি বেশ গম্ভীর। অমিতাভদাকে বাদ দিলে অন্যান্য পূর্বজন্মের সাথে আমি কিন্তু সহজ ভাবেই মিশতাম কিন্তু কোন এক অজানা কারণে আমার তাঁকে বেশ রাগী বলেই মনে হতো। ক্রমে ক্রমে অমিতাভদাও বাকী সদস্যদের মতই আমার কাছে সহজ হয়ে যান। এরপর তাঁকে আমি কখনো আমার সহ-অভিনেতা কখনো পরিচালক আবার কখনো বা শিক্ষকের ভূমিকায় পেয়েছি। তিনি যে লেখক হিসাবেও কতটা শক্তিশালী ছিলেন তার পরিচয়ও বারবার পেয়েছি। খড়্গপুরের বহু জ্ঞানী গুণী মানুষই তাঁর এই লেখক সত্তার সাথে পরিচিত, বাংলা এবং ইংরেজী উভয় শব্দ ভান্ডারের উপর এত অনায়াস দখল আমি খুব কম মানুষের মধ্যেই দেখেছি। সেই সাথে ছিল বিশ্ব সাহিত্য এবং রাজনীতি সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্য। এরপর আসি দ্বিতীয় অধ্যায়ে। যেটার স্থায়িত্ব শেষের কটা বছর এবং অবশ্যই তা আমাদের দুর্ভাগ্য। এই কয়েকটা বছর তাঁর সাথে আমাদের সিনিয়র-জুনিয়রের ব্যবধান ঘুচে গেছিল। কী এক অদ্ভুত কৌশলে তিনি আমাদের বন্ধু হয়ে গেছিলেন। অগ্রজের সম্মান নিয়েই। ওই যাকে বলে ফ্রেন্ড - ফিলজফার গ্র্যান্ড গাইড। তিনি নিজেই তাঁর গন্ডি থেকে আমাদের গন্ডিতে প্রবেশ করেছিলেন স্ব-সম্মানে স্ব-গৌরবে। তা না হলে তাঁর গন্ডিতে প্রবেশ করবার সাহস আমাদের কোনদিনই হত না। সেই মেধা আমাদের এই প্রজন্মের মধ্যে অতি দুর্লভ। কত মজা, কত হাসি, কত সংকটময় পরিস্থিতিতে বাড়িয়ে দেওয়া সাহায্যের হাত। দলগতভাবে আমাদের মধ্যে কেউ কোন জবাবদিহির মুখোমুখি হতে পারে বুঝে আগে থেকেই তাকে সাবধান করে অবশ্য করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে আগলে রাখার চেষ্টা। অমিতাভদাকে নিয়ে এমন হাজারো স্মৃতির ঝুলি উপচে পড়ছে। উনি শেষের এই কটা বছর আমাদের সকলকেই খুব স্নেহ করতে শুরু করেছিলেন, সেটা বিভিন্ন সময় আমাদের প্রতি তাঁর ব্যবহারেই বোঝা যেত। কত সময় আমি বলতাম— অমিতাভদা আপনি তো টিউ-তীর্থকে কিছুই বলছেন না অথচ ওরাই আসল নাটের গুরু, কখনো বলতাম

‘তীর্থকে কিন্তু আপনার একটু বেশীই প্রশ্রয় দেওয়া হয়ে যাচ্ছে অমিতাভদা’। উনি শুধুই স্নেহ মিশ্রিত প্রশ্রয়ের হাসি হাসতেন। অনুজ হিসাবে পূর্বজদের প্রতি, আর পূর্বজ হিসেবে অনুজদের প্রতি যে একটা শ্রদ্ধা এবং স্নেহের দায় থাকে, অন্তত থাকা উচিত সে কথা তিনি যে শুধুই আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করতেন তাই নয় নিজেও সেই দায় পালন করার চেষ্টা করতেন। তিনি যখন ‘তোতা কাহিনী’-র দায়িত্ব নিলেন এবং একাধিক কল শো-তে আমাকেই ম্যানেজারের দায়িত্ব সামলাতে হয়েছিল তখন আরো ভালো ভাবে আমি এ কথা বুঝতে পেরেছিলাম। এই নাটকে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি সদস্যের কার কী স্বভাব বৈশিষ্ট্য এবং কী করে কারো মর্যাদায় আঘাত না করে ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করতে হয় যাতে আমাকেও কেউ ভুল না বোঝে সে ব্যাপারে অমিতাভদা ফোনে দীর্ঘক্ষণ আমার সাথে কথা বলেছিলেন। এই ফোনালাপের প্রসঙ্গেই আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আলকাপ-এ তাঁর শেষ নাটক ‘অক্টোপাস লিমিটেড’-এ আমাকে খুব ছোট্ট একটা চরিত্রে অভিনয় করতে হয়। সেটা নিয়ে আমার মনে নানান দ্বিধা ছিল। মনে হয়েছিল এতটুকু একটা চরিত্রে কোথায় অভিনয় করবো। একথা আমি অকপটেই অমিতাভদাকে জানিয়েছিলাম। মিথ্যা বলব না, মনের মধ্যে অনেক ভয় কাজ করছিল। মনে হচ্ছিল অমিতাভদা ব্যাপারটাকে মানে আমার কথাগুলোকে কীভাবে নেবেন। কিন্তু আশ্চর্য ভাবে উনি এত স্বাভাবিক ভাবে গভীর মনোযোগসহ কথাগুলো শুনছিলেন এবং সেদিন থেকে বেশ কিছুদিন বিভিন্ন সময় ফোন করে উনি আমাকে বোঝাতেন কেন ছোট্ট হলেও চরিত্রটা নাটকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। চরিত্রটা তৈরী করার জন্য নানান উপদেশ দিতেন। আস্তে আস্তে আমিও চরিত্রটার সাথে একাত্ম হয়ে গেছিলাম এবং আমার মনে আর কোন দ্বিধা ছিলনা। আজ লিখতে বসে এমন কত স্মৃতি মনের কোণায় ভীড় করে আসছে, কত আর বলি। যখনই কোন শো খুব ভালো হতো, দর্শক উচ্ছ্বসিত হতো কিংবা সমবেত টিম ওয়ার্ক তাঁর মনমত্তে হতো তাঁর চোখে মুখে এক ধরনের জ্যোতি লক্ষ্য করতাম। এ প্রসঙ্গে চন্দননগর ও গড়বেতায় ‘চড়ুইভাতি’-র শো-দুটোর কথা মনে পড়ছে। এই শো দুটো এক অসাধারণ মানে পৌঁছে ছিল এবং দর্শক - উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। তাঁর সেই উচ্ছ্বসিত উজ্জ্বল চোখ দুটো আমাদের সবার মনে থাকবে। গড়বেতা থেকে ফেরার পথে খুশী হয়ে তিনি সবাইকে রসনায় রসসিক্তকারী গড়বেতার প্যাঁড়া খাইয়েছিলেন। চিত্রপরিচালক পার্থ সারথি জোয়ারদার পরিচালিত স্বপ্ন দৈর্ঘ্যের ছায়াছবি ‘ব্যাকসেজ’-এর কথা এখানে না বললেই নয়। কারণ এই ছবিতে অভিনয় করার সুত্রে খুব কাছ থেকে টানা দু’দিন আমি অমিতাভদাকে দেখার

সুযোগ পেয়েছি। তখনই দেখেছি তাঁর ধৈর্য, অধ্যবসায়। নতুন কোন জিনিসকে আয়ত্বে আনতে গেলে যে কী প্রচণ্ড মনোযোগী এবং শ্রদ্ধাশীল হতে হয় সেই সময় সেটা অমিতাভদাকে দেখে শিখেছি। আমার চিরপরিচিত অমিতাভদা তিনি নন, ওই দু-টো দিন নতুন রূপে তাঁকে আবিষ্কার করেছি। সেদিন বুঝিনি কিন্তু আজ বলতে দ্বিধা নেই, এই ‘ব্যাকসেজ’ আমার কাছে সৌভাগ্যস্বরূপ কারণ আগামী দিনে যখনই চাইবো, এর মধ্য দিয়েই চলমান অমিতাভদাকে এবং তাঁর অভিনয় দেখতে পাবো।

প্রণাম অমিতাভদা। আলকাপের ঘরে আর আপনার হাতে রাখি বাঁধা হবে না। দোলের আবির আপনার পায়ে দেওয়া হবে না। কল শোতে গেলে আলাদা করে আপনার জন্য শশা, মুড়ি, ক্রিমক্র্যাকার প্যাক করতে হবে না। আপনি তো আর শোয়ের শেষে বলবেন না – ‘চন্দ্রস্পর্শা’, শশা মুড়ি এনেছেন নাকি?’ শেষের বছর দেড়েক দেখতাম আপনি আলাদা করে কিছু খেতে চাইতেন না। ওই শশা মুড়ি বা একটা বিস্কুট ছাড়া। তবে আপনি ভোজনবিলাসী ছিলেন। মাঝে মাঝে আলকাপের পরিসরে, সেই পরিচয়ও পেয়েছি। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল একাধারে আপনাকে পরিচালক এবং সহ-অভিনেতা হিসাবে পাওয়ার। এই দুই রূপেই যখন আপনি নাটকের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতেন এবং নানাবিধ পরামর্শ দিতেন তখন প্রতিবারই নতুন নতুন বিষয় ও দিক সম্পর্কে জানতে পারতাম। এই প্রজন্মের কেউই আপনার মেধার সমকক্ষ নয় কিন্তু আপনার ব্যবহারে কোনদিনও তা বুঝতে পারিনি। যেন আমরা সবাই এক। তাই যখনই কোন কারণে আমাদের মতামত চাইতেন খুব মনোযোগ দিয়ে সেটা শুনতেন। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের অমিতাভদার জন্য আফশোষ থেকে যাবে আজীবন, এত কম সময় পাওয়ার জন্য। আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই ‘চডুইভাতি’-তে আমাকে নির্বাচন করার জন্য। এই নাটকে অভিনয় করার কারণেই চন্দননগরের উচ্ছ্বসিত দর্শক আমায় ঘিরে ধরেছিল। বাংলা নাট্য জগতের এক অসামান্য প্রতিভা শ্রী তীর্থঙ্কর চন্দ মহাশয়ের কাছে প্রশংসিত হয়েছি একাধিকবার। আমার মত এত সাধারণ মানের অভিনেত্রীর কাছে এ এক পরম পাওয়া। আমরা তো সময় মত অনেক কথা-ই বলে উঠতে পারিনা তাই পরবর্তীকালে আফশোষটাই সম্বল হয় কিন্তু আমি আপনাকে আমার এই কৃতজ্ঞতার কথা নিজ মুখে বলতে পেরেছিলাম। এও আমার এক ভাললাগা। আপনি কোথাও যাননি অমিতাভদা। আমাদের মনেই আছেন ও থাকবেন। থাকবেন আলকাপের ঘর, মঞ্চ, আলোর বৃত্তের সর্বত্র। আপনার এই অকাল প্রয়াণ আলকাপকে নিঃস্ব করল। এ ক্ষতি কোন সামান্য ক্ষতি নয়, অসামান্য, অপূরণীয় ক্ষতি।

অমিত আভা

অভীক চক্রবর্তী

(লেখকঃ আলকাপের সদস্য)

বড় মায়াবী ছিল সেই সন্ধ্যা। বিরঝিরে বৃষ্টি, ভেপার ল্যাম্পের সেপিয়া আলোয় এক নিঃসঙ্গ অনুভূতি সারা সেশনটার গা জুড়ে। এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে হাতে গোনা কয়েকটি মুখ। সহযাত্রী আর হকার। একরাশ ক্লান্তি আর অসংখ্য না পাওয়ার বেদনা নিয়ে সকলেই অপেক্ষমান সেই ট্রেনটির, সেটি আমাদের মতোই নিঃসঙ্গ। ডাউন টাটা খড়গপুর লোকাল। সেশন ঝাড়গ্রাম। ঘড়িতে সময় রাত্রি নটা। আমার এই নিঃসঙ্গতা বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না অমিতাভদা। বাস মিস করে আজ আপনিও আমার সহযাত্রী। ওটাই আপনার সঙ্গে কাটানো শেষ ব্যক্তিগত মুহূর্ত। এমন মুহূর্ত অনেক কেটেছে সকলের অলক্ষ্যে। প্রকাশ্যে থেকেছে অনেক মনোমালিন্য, মান-অভিমান নাটককে কেন্দ্র করে, সংগঠনকে কেন্দ্র করে, কিন্তু এমন ব্যক্তিগত মুহূর্ত তা এখন কেবলই আমার। জীবনের প্রথম প্রেমে আঘাত খেয়ে আমি যখন দিশেহারা, এমনই এক নিবুন্ম নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় আপনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন টিক্কার দোকানে। একটা গোটা সন্ধ্যা আমায় সঙ্গ দিলেন কি নিশ্চুপ অভিভাবকত্বে। যতবার চাকরি ছেড়েছি আপনার মুখে দেখেছি দুঃশ্চিন্তার ছায়া। এখনো মনে আছে শেষবার যখন চাকরি ছাড়বো ছাড়বো করছি আপনি বলেছিলেন, "আমাদের মনের মতো করে চারপাশটা গোছানো নয় টিউ। মনটাকে গুছিয়ে নিতে হয় চারপাশের মতো করে"। না অমিতাভদা, আপনি আপোষ করার কথা বলেননি, বলেছিলেন খড়কুটোর মতো সামান্য হলেও ভালোটাকে খুঁজে নিতে, আর সেই ভালোটাকে আশ্রয় করেই যত দূর যাওয়া যায়, যেতে। আপনার পরিচালিত নাটক 'অন্যমুখ' যখন প্রায় প্রস্তুতির মুখে কুইন নামক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ছেড়ে আমি চলে গেলাম কলকাতায় যাত্রা করতে। আপনার অভিমান হয়তো হয়েছিল, কিন্তু তাকে হাসিমুখে অগ্রাহ্য করে আপনি আমাকে নতুন জীবনের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন অমিতাভদা। আমার ব্যক্তিগত লেখালেখি পড়াশোনা সবেতেই আপনার সুচিন্তিত মতামত বরাবর পেয়ে এসেছি, কিন্তু তারপরেও আপনার সঙ্গে ছিল আমার অনেক বিরোধ। সমালোচনা করেছি আপনার অনেক, প্রকাশ্যেই। সময় মতো মহলায় না আসা, আসবো বলেও অনুপস্থিত থাকা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছি। বিরোধিতা করেছি আপনার সাংগঠনিক চিন্তা ভাবনার। কিন্তু এতো সব কিছুর পরেও অবাক বিস্ময়ে দেখেছি আপনার অভিনয়, আপনার পরিচালনা। মহলায় কম উপস্থিতির পরেও, স্বেচ্ছা রিহার্সালের সময়ও পাঠ মুখস্থ না হওয়ার পরেও দেখেছি আপনাকে একটার পর একটা অনবদ্য চরিত্র চিত্রায়ন করতে। মঞ্চ জুড়ে শুধু আপনি। আপনার অমিত আভায় বাকি সব আলোকিত। বুঝেছি, চরিত্র নির্মাণ হয় অন্তরে, আমরা তো বাইরেটার পূজারী মাত্র। আপনার

পরিচালনায় অভিনয় করতে গিয়ে আপনার অভিনেতা সত্তার অনেক পরিচয় পেয়েছি। কখনো বলে দেননি এটা কর ওটা কর এইভাবে ওইভাবে, না, বরং আপনি সাংঘাতিক স্বাধীনতা দিয়েছেন আমাদের। উৎসাহিত করেছেন চরিত্রটির সন্ধান, যা আপনিও একজন অভিনেতা হিসেবে চেয়ে এসেছেন আজীবন। ‘ভাবো ভাবো... ভাবা প্র্যাকটিস করো’ এই বহুল ব্যবহৃত শব্দবন্ধকে আপনি চর্চা করেছেন আপনার কাজ কর্মে। অভিনেতাদের দিয়েছেন তাদের নিজস্ব পরিসর। এই ‘প্র্যাকটিস’ এখন বড় দুর্লভ অমিতাভদা। হয় সময়ের অভাবে নয়তো সহ-নাট্যকর্মীর উপর বিশ্বাস- এর অভাবে, এই চর্চা এখন প্রায় হয় না।

শেষ রেল যাত্রায় আপনি ছিলেন বক্তা আর আমি শ্রোতা। আপনি বলেছিলেন পরিচালক ও তার মানস সন্তান নাটকের কথা। বলেছিলেন, থিয়েটার হল ‘ডিরেক্টর্স প্লে’। অমিতাভদা, আপনার দীর্ঘনাট্য জীবনের অভিজ্ঞতায় অনেক নির্মাণ অনেক স্বপ্নের অপমৃত্যু হতে দেখে, সংগঠনের কথা ভেবে শিল্পের সাথে আপোষ করে, আপনি হয়তো এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, নাটকটা পরিচালকেরই এবং সাংগঠনিক প্রটোকল অধিকাংশ সময় নাটক ও পরিচালকের মাঝের দেওয়াল। কিন্তু অমিতাভদা, আমি জানি। আমি দেখেছি আপনার নির্মাণকৌশল, যেখানে নাটকের পাত্র - পাত্রী নেপথ্য কর্মীরা শুধুই ব্যবহারের উপাদান নয়। রং তুলি বা মাটির তাল মনে করে আপনি তাদের দিয়ে শিল্প সৃষ্টি করেননি, চেয়েছেন তাদের মনন ও চিন্তন নিয়ে সজীব যোগদান। এই বোধের এই ধৈর্যের এখন বড় অভাব। সত্যিই এখন নাটক হল ‘ডিরেক্টর্স প্লে’। মঞ্চের সামনে পেছনে দাপিয়ে বেড়ায় একদল মানুষ যারা প্রত্যেকেই পরিচালকের ক্লোন। না অমিতাভদা, ডিরেক্টর্স প্লে বলতে, মঞ্চে একদল অমিতাভ চলে ফিরে বেড়াক এ আপনি বোঝেননি। আপনার চর্চায় বাহ্যিক নির্মাণ স্থান পায় না, পায় অন্তরের সৃজন। আসলে আপনার মনে হয়েছিল সংগঠন বা ব্যবস্থা অনেক সময় শিল্পীকে একটা গন্ডির মধ্যে বেঁধে দেয়। গন্ডিবদ্ধ মন কি সঠিক শিল্প সৃষ্টি করতে পারে? এই ভাবনার মধ্যে দিয়ে আপনি ব্যক্তিকেন্দ্রিক নাট্যচর্চার পক্ষ অবলম্বন করতে চাননি, আপনি বরাবরই সমষ্টিকেন্দ্রিক নাট্যচর্চাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। এই চিন্তার সূত্র ধরে শিল্পীর স্বাধীনতা ও একটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার ফলে যে নিয়মতন্ত্র মাথা তুলে দাঁড়ায় তাদের মধ্যকার ঠান্ডা লড়াইয়ের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন।

বড় অসময়ে চলে গেলেন অমিতাভদা। আপনার কাছে আরো অনেক কিছু শেখা বাকী রয়ে গেল। সংগঠন নিয়ে, নাটক নিয়ে আপনার সাথে অনেক তর্ক, অনেক কথা কাটাকাটি। আসন্ন সময় বড় কঠিন, অমিতাভদা। চারপাশটা বড় দ্রুত বদলে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত পালে যাচ্ছে বিশ্বাসের মানদণ্ড। এই অন্ধকার সময় আপনার সঙ্গে বিতর্কগুলো বেশ জমতো। কারণ বিতর্ক করার মানুষের এখন বড়ই অভাব।

স্মৃতির পাতা ওলালেই, তোর মুখ ভেসে আসে...

অলোক ব্যানার্জী

[লেখক: আলকাপের শুভানুধ্যায়ী সদস্য]

সময়ের দুর্বিপাকে আমাকে কলম ধরতে হলো। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক যার সাথে (লেখার) আমার দৈনন্দিন কর্মজীবনের কোন যোগ নেই। একটা সময় আসে যার কাছে নতজানু হয়ে যায় সকলে। তাই লিখতে বসলাম লালুর সম্বন্ধে। আমাদের সবার অমিতাভ বসু। চাই বা না চাই ওকে যেতেই হলো। মানুষ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা গড়ে তোলার জন্য যেমন চাই তা কারও নেই, কথাটা আমার নয়, তাই অনেকে অনেক কথা বলে ওর সম্বন্ধে, তখন ভেতরে কষ্ট হয়, দুঃখ হয়। যাক সে কথা, ওর সাথে পরিচয় বা আলাপ বা বন্ধুত্ব কবে থেকে জানিনা, কারণ মার কাছে শোনা দুজনেই সেই সময় কোলে করে ঘুরতাম তারপর একসাথে স্লোট পেন্সিল নিয়ে ক্লাস ওয়ান। প্রাইমারী স্কুল থেকে যাত্রা একেবারে মাধ্যমিক পর্যন্ত। আলাদা হলাম উচ্চমাধ্যমিক থেকে। তখন থেকে পড়াশোনাতেও আলাদা হলাম, কিন্তু বন্ধুত্ব অটুট। তার প্রধান কারণ আমরা এক পাড়াতেই থাকি। সেই সময় থেকে দেখেছি ও লেখাপড়ায় ভালো যা আমি মোটেও নই। হাতের লেখা তখন থেকেই ঈষদীয়। ফাইভ থেকে একটু আধটু কবিতা লেখার অভ্যাস ছিল। নিজেকে একটু পরিপাটি রাখা, এইসব লক্ষ্য করতাম তখন থেকে। ধীরে ধীরে ওর প্রতি একটা দুর্বলতা বা মোহ তৈরি হয়েছিল। আমি ডানপিটে, ওকে কেউ কিছু বললে আমার সহ্য হতো না। পড়াশোনায় ভালো স্বাভাবিকভাবে ওর থেকে একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছিলাম। হঠাৎই নাটক আমাদেরকে আরো দৃঢ় বন্ধুত্বের জায়গায় পৌঁছে দিল। দুজনেই নিমাই কাকুর হাত ধরে “শিল্পীমন” নাট্যদলে অভিনয় করা শুরু করলাম। একসঙ্গে রাত জাগা, দুষ্টুমি করা, আরো কতকি যে কান্ড করেছি যা লিখতে গেলে বাজে হবে ব্যাপারটা। ওর শেষ বেলায় আমাদের একটা ফাঁক তৈরি হয়েছিল আমার কর্মজীবনের জন্য, যা মুঠোফোনের কল্যাণে কিছুটা মেরামতির জায়গায় ছিল। আজ ও নেই। কত কথা কত স্মৃতি ভিড় করে আসছে। কোলকাতায় নাটক দেখা, রাত জেগে যাত্রা দেখা, মাঠে খেলতে যাওয়া, খুব ভালো আবৃত্তি করতো আর আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বসে বসে মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। বাপু আমার অল্প বয়সে অমিতাভ বচ্চনের ফ্যান ছিল তাই চুলের কাটিং তার মতো করে তৈরি করেছিল, আমার খুব সুন্দর লেগেছিল। যাক সেসব কথা, আমি বলি মানুষ অমিতাভ কেমন ছিল আমার কাছে, খুব কি পরোপকারী? ডাকাবুকো? অসাধারণ বাগ্মী? সুঅভিনেতা? সুলেখক? না, আমার কাছে এরকমটা কোনদিনই মনে হয়নি। কিন্তু যে কাজটা করতো সেটার ওপর নিষ্ঠা ছিল, ভালোবাসা ছিল, সর্বোপরি পরিষ্কার ঝকঝকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করত এবং নিজের কাছে যতক্ষণ না পরিষ্কার হচ্ছে ততক্ষণ সেটা ও মাজা ঘষা করেই যেত। তাই

ওর যে কোন বিষয় অতো সুন্দর বাকবাক্যে পরিষ্কার লাগতো আমার কাছে। প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি ছিল যা আমাদের অনেককে চার পাঁচ খাপ পেছনে ফেলে দিতো।

হঠাৎ ওর জীবন বইতে লাগলো অন্য খাতে। বাস্তব জীবনের রুক্ষ মাটিতে ওর সেই নায়ক সুলভ সিদ্ধান্ত ওকে ক্লান্ত রিক্ত শূন্যতায় ভরে দিচ্ছিল। ওর ভেতর ছুটে বেড়ানো ছটপটে প্রজাপতিটা ক্রমশ বিলীন হয়ে গেল, হারিয়ে গেল, আর আমি আমার প্রিয় বন্ধু একজন মননশীল বিনয়ী লাজুক ভালোবাসার মানুষকে ফেলে অনুষ্ণহীনতায় ডুবে যাচ্ছি।

কাকে বলি

কৌশিক ঘোষ

(প্লুতস্বর, পত্রিকার প্রকাশক)

লালু নেই। তোমাদের অমিতাভদা। অমিতাভ বসু। পরিচালক অভিনেতা। জীর্ণ প্রাণের আবর্জনা স্তুপের দাহক অগ্নিব্রত সেন। আমার ছোট ভাই, ছাত্র, শিষ্য, বন্ধু, শূভার্থী প্লুতস্বরে আমার সহকর্মী, আবৃত্তির জগতে আমার যুগলবন্দী। আমি লালু নামেই ডাকতাম। আর আমি শেষ টেলিফোনেও ওর বুলাদা। সমস্ত পরিচয়ের অনুবর্তী ওই দাদা। মনে পড়েনা কখনো ভুলে গেছে আমি ওর দাদা। একসঙ্গে বাস করেছি প্রায় পঞ্চাশ বছর। মনোমালিন্য কম হয়নি। দাদার পরিচয় তবু অমলিনই থেকে গেছে। আমায় স্মৃতিচারণ করতে বলেছো আমার ভাইয়ের। কপালে এও ছিল! কিন্তু কি বলব, কি লিখব আমি। পঞ্চাশ বছরের এত অজস্র খুঁটি-নাটি যে একটা আলকাপের চিঠিতে ধরবে না ভাই। একটা ছোট্ট ছেলে কি মিষ্টি যে দেখতে ছিল। একটা ফোটো ছিল আমার সংগ্রহে। বহুদিন। হারিয়ে গেছে যেমন আমার সব কিছু হারিয়ে যায়। যেমন আমার ছোট ভাইকে ধরে রাখতেও আমি অক্ষম। আস্তে আস্তে চোখের সামনে বড়ো হয়ে উঠল। তখন ওর ক্লাশ ইলেভেন আর আমার কলেজে ফার্স্ট ইয়ার কি সেকেন্ড। ইংরেজী বাংলা পড়তে এল আমার কাছে। সায়েন্স নিয়ে পড়ত। ভীষণ মেধাবী ছাত্র। কিন্তু তখন তো গায়ে হাওয়া লেগেছে। কাব্যচর্চা করি আমরা, সুনীল গাঙ্গুলীর শিষ্য। আবৃত্তি করি। ওকেও কবিতা লিখতে হবে আবৃত্তিও করতে হবে। অতএব ভয়ানক পন্ডিত গুরু আর তার ততোধিক বিনয়াবনত ছাত্র! কবিতা কেন লিখল না জানি না, আবৃত্তিতে আমার কোন নাম হয়নি, ওর নামডাক কিছু কম হয়নি। হায়ার সেকেন্ডারীর পর ছেড়ে দিল বিজ্ঞান, বেছে নিল সাহিত্য। ওর বাবা-মা যারপরনাই অসন্তুষ্ট হলেন। নিজেদের ছেলের ওপর যতটা না তার চেয়ে শতগুণ বেশি তার মন্ত্রণাদাতার ওপর। তাঁরা বিশ্বাস করলেন তাঁদের ছেলের বিগড়ে

যাবার পিছনে গোলমেলে এই লোকটা।

প্রেমের জন্ম এই আমার বাড়িতে। প্রথম প্রেমের অবসানেও সেই আমি। কলেজে পড়ল, আলকাপে যোগ দিল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাদ পেল সং সাহিত্যের আর সত্যিকারের প্রেমের। ও ভাবত সত্যিকারের প্রেম। আমি ভাবিনা কখনও। আমার কাছে প্রেম-ট্রেমের কোন মূল্য নেই। ওর কাছেও কি ছিল পরবর্তী কালে? মনে হয়না। মাঝে মাঝে মনে হয় প্রেমের ওই দড়ি টানাটানি খেলায় এক অমূল্য প্রাণ ঝরে গেল। অমন রূপ, অমন গুণ একাধারে লেখক, অভিনেতা, পরিচালক, আবৃত্তিকার, বক্তা—আমি আমার একটিও বন্ধুর মধ্যে দেখিনি। আমার শহরের গুণীজনের মধ্যেও দেখেছি বলে মনে পড়েনা। শেষ ফোনটা এখনো আমার কানে বাজে। তখন খুব অসুস্থ। বোধহয় বোনম্যারো টেস্ট হয়েছে কিম্বা হবে। একটু হেসে বলল, যা অনিবার্য তা তো হবেই। কি নির্লিপ্ত গলা। ওকি বুঝতে পেরেছিল আর সময় নেই। আমি পারিনি। কি হতভাগা আমি জানো। আমি ঠাট্টা করেছিলাম—অনেক পাপ করেছিস। অতো সহজে যাচ্ছিস না। তারপরেই সেই ভেন্‌লিশন, সংজ্ঞাহীন দিন রাত। আর ঐখানে আমাদের অসহায় প্রতীক্ষার প্রহর!

সকালে পড়াচ্ছি। মোবাইল জ্বলে উঠল। দেবদাসদা (অভিনেতা দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)-র মেসেজ — অমিতাভ চলে গেল।

অমিতাভ

সঞ্জীব সরকার

(সম্পাদকঃ আনন্দন নাট্যসংস্থা, ঝাড়খাম)

টিউ যখন বলল অমিতাভের উপর কিছু লিখতে হবে, তখন মনে হল এরকম তো হওয়ার কথা ছিল না, অমিতাভ ছিল সুদর্শন ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী আর আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, সে যে আমাদের ছেড়ে এভাবে চলে যাবে ভাবতে পারিনি।

অমিতাভ ওরফে লালুর সাথে আলাপ হয় সুরজিৎ ঘোষ-এর মাধ্যমে। তখনো অমিতাভ আলকাপে আসেনি। কবিতা লিখত। তারপরে আলকাপে আসে এবং অভিনেতা ও পরিচালক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে।

বাংলা শিক্ষক অমিতাভ প্রাবন্ধিক হিসেবে অনেক সুনাম অর্জন করেছে। আনন্দন অনিয়মিত ভাবে একটি নাটকের পত্রিকা প্রকাশ করে এরিনা নামে। শেষের কয়েকটা বছর অবশ্য নিয়ম করে পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে। অমিতাভর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ নাট্য পত্রিকা এরিনাতে প্রকাশিত হয়েছে। ঝাড়খামের নাট্যচর্চার ইতিহাস লিখতে গিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করেছিল। বিভিন্ন জনের ইন্টারভিউ নেওয়া, বিভিন্ন

লোকের সাথে কথাবার্তা বলা। একসময় ওর সাথে আমার কথা হয়েছিল অবিভক্ত মেদিনীপুরের একটি পূর্ণাঙ্গ নাট্যচর্চার ইতিহাস তৈরি করবে। পরবর্তীকালে ও ঝাড়গ্রামের পরে মেদিনীপুর ও খড়্গপুরের নাট্যচর্চার ইতিহাস খুব সম্ভবত লিখেছিল। ঝাড়গ্রামের নাট্যচর্চার পরে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করে অমিতাভ, শঙ্কু মিত্র কে নিয়ে একটি মহাজীবন কে ফিরে দেখা, খড়্গপুরের নাট্যব্যক্তিত্ব প্রদীপ সরকারের জীবন ও কাজ নিয়ে।

অমিতাভের আরও একটা দিক ও ভালো কবিতা আবৃত্তি করতো। ঝাড়গ্রামে বেসরকারি উদ্যোগে ঝাড়গ্রাম বই মেলা গঠিত হয় এবং আনন্দান তার সদস্য। বইমেলা কমিটি ঠিক করে বইমেলা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা আনন্দন পরিচালনা করবে। সেই মতো আমরা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে অমিতাভকে বারবার পেয়েছি। ওর অবর্তমানে আমরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবো। ওর আত্মার শান্তি কামনা করি।

প্রকৃত বন্ধু ও আপনজনকে হারালাম

শঙ্কুনাথ সাহা,

সহকর্মী করণিক, সিদ্ধেশ্বরী হাইস্কুল, খড়্গপুর

অকালে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন অমিতাভ বসু। সহশিক্ষক, প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। আর্হমা আরামবাটি শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী হাইস্কুলের।

কার্যকাল : ০৪-১-১৯৯৪ থেকে ০৩-০৩-২০২০। কলকাতার Peerless হসপিটালে ০৪-০৩-২০২০ তারিখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আমার কাছে উনি ছিলেন অভিভাবক ও বড়দাদার মতো। আমার ব্যক্তিগত জীবনে অপূরণীয় ক্ষতি হল। উনি সব সময় আমাকে সু-পরামর্শ দিতেন। ২৬ বছরের বন্ধুত্ব। ঝাড়গ্রাম এলে আমার বাড়িতে দেখা না করে যেত না। উনি খুব খাদ্যরসিক ছিলেন। মজাদার মানুষ ছিলেন। গল্প করতে খুব ভালোবাসতেন। উনি খুব ভ্রমণ পিপাসু ছিলেন। প্রায়ই উনার মোটর বাইক করে অনেক দূরদূরান্ত ঘুরতে যেতাম। মন্দিরময় পাথরা, মোগলমারি, নিমপড়া, চন্দ্রকোণা, দাঁতন, গোপীবল্লভপুর, ওই সব স্মৃতি শুধু মনে পড়ে। ওই রকম মনের মানুষ আর কোনদিন পাব না। অজানাকে জানার ওনার খুব ইচ্ছে ছিল। শিক্ষক হিসেবে ওনার কোন তুলনা হয় না। ছাত্র-ছাত্রীদের খুব যত্ন সহকারে পড়াতেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, বন্ধুসম দাদা, পরোপকারী, মজাদার, খাদ্যরসিক। বিপদে সুপরামর্শ দেবার মানুষটাকে কোনদিন পাশে পাবো না। “সময় চলে যাবে, জীবন চলে যাবে, স্মৃতিটুকু আজীবন রহে যাবে”।

তুইও ? অগ্নিব্রত !

অঙ্কন মাইতি

(অমিতাভ বসুরসুহৃদ, লেখক ও প্রকাশক)

রাস্তাটা ক্রমশ একা হতে হতে, একটা মাঠের প্রান্তে এসে নিজেই হারিয়ে গেল। এককোণে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা নাটমন্দিরের কালো ব্যাকড্রপে বিচিত্র নানারঙের মন্তাজ। একটা কণ্ঠস্বর ভেসে বেড়াচ্ছে চরাচরে। কেউ নেই, কোন দর্শকও ...।

আলোআঁধারের কংসাবতীর নির্জনতা ছারখার করে একটা কবিতা ছড়িয়ে পড়ছে ওপারের ধূসর হেমন্তের রঙে। সেই কণ্ঠস্বর। দেখতে পাচ্ছি বদ্ধজল কেমন করে শব্দের সাথে নেচে মেতে ওঠে। আর কেউ নেই, কোন স্রোতাও।

সেশনের গাছটাতে পাখিও বসে না। উচ্ছ্বাসে, অক্ষরে বোধহয় বিরক্তই হয়। দ্রুতগামী ট্রেনও জানে এখানে, এসময় নিঃশব্দ মেনে চলা প্রথা। কবিতা ছাড়া আর কিছুই এসময় উচ্চারিত হবে না। রাতের গন্ধ নিয়ে থেমে থাকা পশ্চিমী ট্রেনে হঠাৎ ডানা মেলে উড়ে যাওয়া পাখি, জনারণ্যে মিশে গেল অনন্ত আকাশে। কবিতার রেশ রেখে শুধু বলে গেল, আবার কোন একদিন আমরা সবাই ... সেই শব্দ। এখন কেউ নেই, একজন যাত্রীও ...।

মৃত কবিবন্ধুর শোকসভা ঘিরে আমাদের হাতে হাত রেখে স্তব্ধ থাকার দিনে, আমরা একবুক শূন্যতার দিকে তাকিয়ে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছি, অতীতের পথে। কাল্পনিক কীভাবে নীরব পাথর হয় সেদিন বুঝেছি। কোন শব্দ নেই, প্রিয় কবিবন্ধুও আজ নেই ...।

অগ্রজ কবির কাব্যগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচনে, লাল আগুনের পোষাক কি সশব্দ হয়ে আমাদের ইশারা করেছিল বিয়োগের! সেই শব্দ কিছুটা এলোমেলো, কিন্তু বাড় উঠবে, আশঙ্কা করিনি। কিংবা বইমেলায় ধুলোর গন্ধমাখা উশৃঙ্খল শেষ বিকেলে আমরা চার দেওয়ালের অন্ধকারে আলো খুঁজবো বলে একসাথে সমবেত হয়ে উচ্চারণ করেছি নিস্তব্ধ প্রতিবাদ। আজ অনেকেই আছি,

আকাশ ছোঁয়ার স্পৃহা মানুষকে স্বপ্নময় করে তোলে।
অগ্নিব্রত, তবে আগুন কেন? উর্ধ্বমুখী বলে?
সরলরেখার নিয়মে ক্রমশ ছায়া দীর্ঘ হয়, আজ অবশিষ্ট
ছাই পড়ে আছে।

শূন্যতার ও শোকের কোন শব্দ নেই।

আমাদের একলা করে, অমিতেশের মতো তুইও ... ?
অগ্নিব্রত!

শেষ দেখা হল না

দীপক বসু

(লেখকঃ মানবাধিকার কর্মী)

অকাল প্রয়াতদের নিয়ে লিখতে খুব কষ্ট হয়। বিশেষত সে
যখন বছর দশেকের ছোট হয়। তবু লিখতে হয় এই
পরিস্থিতিতে যেহেতু অন্য কোনভাবে স্মৃতিচারণার বা শ্রদ্ধা
জানানোর উপায় নেই।

অমিতাভর কথা বলছি, অমিতাভ বসুর সাথে আমার প্রত্যক্ষ
পরিচয় অনেক পরে। ও তার অনেক আগে থেকেই আমায়
জানত। মাদ্রাজ থেকে লেখা আমার মাসার মশাইকে লেখা
আমার চিঠিপত্রের মাধ্যমে, এরকমটাই দাবী করেছিল
অমিতাভ অশোক মুখোপাধ্যায়ের স্মরণ সভায়।

অভিনেতা ও পরিচালক অমিতাভ সম্পর্কে অনেকেই সমৃদ্ধ
স্মৃতিচারণ করবেন, আমি বলব ডুলুং-এর সাথে তার
সম্পর্কের কথা। অমিতাভ শুধু যে ডুলুং-এর একজন পাঠক
ও লেখক ছিল তানয়। তার মত ডুলুং-এর শুভানুধ্যায়ী আর
কেউ ছিল বলে আমার জানা নেই।

উনিশশো সাতাত্তরে ডুলুং-এর প্রকাশক ছিল খড়গপুরের
বোলান দল। উনিশশো ন বইয়ে নব পর্যায়ে যখন ডুলুং
প্রকাশিত হয় তখন বোলান দল নেই। নবপর্যায়ে ডুলুং তার
দু-দশক পর পথ পরিক্রমার শেষে লিটল ম্যাগাজিনের
স্বাভাবিক মৃত্যুর পর তার পুনরুজ্জীবনের জন্য অমিতাভ
আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। বারবার আমার মেদিনীপুরের ফ্ল্যাট
বাড়ীতে ছুটে এসেছে। আমাদের অক্সিজেন যুগিয়েছে।
আমাদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেছে। আমাদের প্রেরণা
দিয়েছে। কিন্তু অক্ষম আমরা, আমরা পারিনি। আমরা
অমিতাভকে হতাশ করেছি। অমিতাভ তুমি আমাদের ক্ষমা
কর।

অমিতাভ তার ব্যক্তি জীবন নিয়ে কোনদিন আমাকে কিছু
বলেনি। আমিও কোন দিন আগ্রহ প্রকাশ করিনি। কিন্তু ওর
কর্মজীবনে ওর কিংবা ওর কোন সহশিক্ষকের কোন সমস্যা

ও আমাকে বলত এবং পরামর্শ নিত ।

খড়্গপুরের মানস- গৌতম-নারায়ণ চৌবে মেমোরিয়াল ট্রাস্-
ডুলুং পত্রিকাকে যে নারায়ণ চৌবে স্মৃতি পুরস্কার ২০১৪
দিয়েছিল, আমি মনে করি তাতে অমিতাভর অতীব
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল । অমিতাভর সক্রিয়তাতেই ট্রাসে র
পরিচালকমন্ডলী ডুলুংকে গণ্য করে এবং যথাযোগ্য
বিবেচনা করে পুরস্কৃত করে । ডুলুং তার জন্য অমিতাভ
বসুর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে । পুরস্কার গ্রহণের জন্য
ট্রাসে র তরফ থেকে যে আমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হয়েছিল
সেটি অনন্য, আমার ধারণা সেটি অমিতাভর লেখা ।

অমিতাভ অসুস্থ হয়ে পিয়ারলেস হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার
পর আমার এক আত্মীয়া এখানে উচ্চপদে থাকার সুবাদে
আমি প্রায় প্রত্যেক ঘণ্টায় ওর শারীরিক অবস্থার খবর
পেতাম । আমার আত্মীয়া আমার উৎকর্ষার কথা ওকে
জানাত, ও সাড়া দিত চোখ মেলে তাকাত কিন্তু কিছু বলতে
পারত না । ঠিক এই মুহূর্তে বেলভিউ নার্সিং হোমে প্রবাদ
প্রতিম অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অবস্থা যেমন ।

মালা হাতে অমিতাভর জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা করেও ওর সাথে
শেষ দেখা হলনা এই আক্ষেপ আজীবন থাকবে ।

অমিতাভদা

মৃণাল শতপথী

(বিশিষ্ট গল্পকার)

অমিতাভদার চলে যাওয়াটা অনেককিছু ওলটপালট করে দিয়ে গেছে। একটা লেখায় কী বলা যায়? নিয়ম করে একটা স্মৃতিচারণ, কিছু ভালো কথা, একটু আবেগ, তারপর রোজের জীবন তার মত বইতে থাকে, বইতে বইতে সেই দূরে জ্বলন্ত সিগারেট হাতে দাঁড়ানো দীর্ঘদেহী মানুষটা হাসতে হাসতে মিলিয়ে যাবেন একদিন। লিখতেই পারছিলাম না, কী লিখবো? একদম কাছের একটা মানুষ, জীবনের যে কোন সমস্যায় চাইলে যাঁকে ফোন করা যায়, ভরাট স্বরে একেকটা বিষয়ের প্রাজ্ঞ ব্যাখ্যা মেলে, দেখা হলে তর্কে বসে যাওয়া, আনন্দ অনুষ্ঠানে হৈ-হুল্লোড় করা একসঙ্গে, বড় আনন্দ করে খেতে ভালবাসতেন। সেই প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর আস্ত একটা মানুষের লহমায় নেই হয়ে যাওয়া এক গুরুতর অবিশ্বাসের জন্ম দিয়ে গেছে। তাঁকে নিয়ে দু-চার লাইন ফরমাসেসি লিখতে গিয়ে বারবার শব্দেরা বিদ্রোহ করছে।

রাজস্থান থেকে ফিরে আসার পর অসুস্থ হলেন। খড়গপুর বইমেলায় যেতে পারেননি। বইমেলায় প্রারম্ভিক মিটিংটাতে ছিলেন তবুও। মুখচোখ দেখে ভালো লাগছিল না। নানা কথার মধ্যে ডাক্তার দেখানোর কথা বলেছিলাম। এবারে বইমেলায় স্মরণিকার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর, লেখা দিতে পারেননি কিন্তু খোঁজ নিয়েছেন নিয়ম করে। অমিতাভদাকে লেখা নারায়ণ চৌবের একটি চিঠি এবার দেবার কথা ছিল স্মরণিকায়, অসুস্থতার টানাপোড়েনে তা আর এল না। লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়নে ছোট পত্রিকার সম্পাদকদের আমন্ত্রণ জানানোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কিছু গাইডলাইন দিয়েছিলেন। না থেকেও যেভাবে পারা, জুড়ে থাকা। যেটুকু ভালো চারপাশে, শত মতপার্থক্য নিয়েও সেই ভালোটুকুর পাশে দাঁড়াতে হয় কিভাবে তাঁর কাছেই শিখেছি।

চিরকালই খুব আপডেটেড মানুষ। প্রচুর পড়াশোনা, কত বিষয়ে যে ওনার দারস্থ হয়েছি। লিখতেন কম। তাঁর স্বভাবজ আলস্য ভেবে মজা করেছি, অভিমান করেছি। পরে বুঝেছি, একটা লেখার ক্ষেত্রে একশো শতাংশ দিতে গেলে যে শ্রম, যে মনোসংযোগ দরকার, সেখানে বিন্দুমাত্র ফাঁকি হচ্ছে বুঝতে পারলে লিখতে বসতেন না। এই শৃঙ্খলা তাঁর অন্য কাজের ক্ষেত্রেও। একটা সিনেমা দেখতেন যখন, তার সামগ্রিকতায় বিচার করতেন। সিনেমা শেষে সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর কাছ থেকে তা শোনা

এক উপভোগ্য বিষয়, অভিজ্ঞতাও। একটা বই পড়ছেন যখন, কবিতা বা কোন গান। অথবা সামান্য একটা ফেসবুক পোস্ট পড়ে মন্তব্য করছেন এত গুছিয়ে, নিটোল শব্দ চয়নে, সময় নিয়ে। বা আলকাপের নাটকগুলির পরিচালনা করছেন যে ডিসিপ্লিন নিয়ে, কোথাও ভুলত্রুটি হয়েছে কিনা জানার এমন আকুলতা! সেই স্থানটা শূন্য পড়ে রইল। অথচ ব্যক্তিজীবনে এই গোছানো জায়গাটা বরাবর বিপর্যস্ত হয়েছে। এখনও মনে আছে, সাউথ ইন্সটিটিউটের বাইরে সিগারেটে নির্লিপ্ত টান দিয়ে তিনি বলে যাচ্ছেন নিজের কথা, এত নির্লিপ্ত, আবেগের ওঠাপড়াহীন। তাঁর চেয়ে বয়সে এত ছোট আমাকে এত কথাই বা বলছেন কেন? বলছেন কারণ সে সময় জীবনের অমসৃণ রাস্তায় পড়ে গিয়ে নড়বড়ে আমাকে তুলে ধরে দাঁড় করাচ্ছেন তিনি। সচরাচর অতি নিকট কারও কাছে ছাড়া নিজের একান্ত ব্যক্তিগত কথা নিয়ে যিনি বরাবর উদাসীন, তা শেয়ার করছেন আমার সঙ্গে। করছেন, কারণ আমার যেটুকু ভালো তা যাতে রাস্তা হারিয়ে না ফেলে। সবখানে যেটুকু ভালো পেয়েছেন, যন্ত্রে রাখতে চেয়েছেন। পাশে থেকেছেন নিশ্চুপে, এতটাই নীরবে যে বোঝা-ই যাবে না।

দেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে আর পাঁচজন সেনসিটিভ মানুষের মত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। ক্ষুব্ধ হতেন, আবেগতাড়িত হতেন, ফেসবুকে উনি ছদ্মনামে আসার পর ওনার বেশকিছু লেখা পড়ার সুযোগ ঘটেছে। শব্দ কুঁদে, সময় নিয়ে সেই অপরিসরের লেখা তৈরি করতেন। শেষের দিকে অদ্ভুত কাব্যময়তায় ভরে থাকতো কিছু লেখা, মুগ্ধ হয়েছি, ওনার লেখার অন্য কোন বাঁক বদল হচ্ছে ভেবে উৎসাহ জেগেছে। আসলে সময়টাকে জাপটে ধরতে চেয়ে নানাভাবে ভেঙে ফেলছেন লেখনী।

আলকাপের নাট্য উৎসবের সময় পরপর দু-দিন একান্তে ওনার সঙ্গে আড্ডা দিয়েছি। রক্তে প্লেটলেটস তখন হুহু নেমে যাচ্ছে। অথচ প্রেমবাজার সোসাইটি থেকে বাইক চালিয়ে আসছেন, ফিরছেন রাতে, নাটকের প্রতি ভালবাসার অন্তর্লীন টানে। নিজের শরীর নিয়ে চিন্তায় ছিলেন। প্রিয় সিগারেট ছেড়ে দিয়েছিলেন। নিয়ম করে ডাক্তার, ওষুধ, টেস্ট। সমস্যা সংকুল জীবন এবং জীবনপ্রবাহের মধ্যে যে অফুরন্ত প্রাণ, যে আলো আকাশ আর সৌন্দর্য, তার প্রতি তাঁর আকুল আকাঙ্ক্ষা টের পেয়েছি এই সময়টাতেই। কি ভীষণ বেঁচে থাকার বাসনা ছিল তাঁর, কত কাজ অপূর্ণ থেকে যাওয়া, কত অপরিপুষ্ট জীবন আমাদের

শুনেছি, চলে যাওয়ার আগের দিন হাসপাতালের বেডে শুয়ে তিনি খবরের কাগজ পড়তে চেয়েছিলেন, আর চেয়েছিলেন গান শুনতে।

ঝড় ও আগুন শাসকের গল্পো

সত্যজিৎ ঘোষ

(লেখক ও 'মহাভারত' পত্রিকার সম্পাদক)

দৃশ্য-১

মিছিলটি এগিয়ে চলেছে বড়বাতি ডি আই জি বাংলোর দিকে। ২০০৭। পুলিশের গুলিতে নিহত ১৪ জন কৃষক। সারা বাংলা জুড়েই প্রতিবাদের ঝড়। সেই ঝড় এই রেলশহরেও। তাই প্রতিবাদ মিছিল ডি আই জি বাংলা পর্যন্ত। ভয় ভালো লাগা শিহরণ নিয়ে আমিও মিছিলে। হঠাৎ পুলিশ পথ আটকে দিল। অনেক পুলিশ। আর এগোনো যাবেনা। মিছিল জমায়েতের মতো গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। অনেকেই বক্তব্য রাখবেন। অদূরে আমি দাঁড়িয়ে। বক্তব্য শুনছি। বক্তব্যের আগুন গায়ে লেগেছে বটে, পুড়ছে না তেমন। লোকজন পাতলা হতে শুরু করেছে। সবাই কেমন শ্লথ। হঠাৎ একটি চমকে দেওয়ার মতো কণ্ঠস্বর। তিনি বলছেন। প্রায় সবাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তিনি প্রতিবাদপত্র পাঠ করছেন। কিছু দূর থেকে দেখলাম, মঞ্চ ডেনিম শার্ট ও প্যান্ট পরিহিত এক বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী সৌম্যকান্তি চরিত্র। ভরাট গলা। ঝাজু উচ্চারণ। ব্যতিক্রমী শব্দ চয়ন, বাচনভঙ্গী এমনই যে শিহরিত না হয়ে পারা যায় না। তিনি বললেন। সবাই গিলল। তাঁকে আমি আগে দেখেছি। আলকাপের নাট্যমঞ্চ। নাম জানিনা। জানার সুযোগ হয়নি। মঞ্চের ওপরের ও নীচের পার্থক্যের বেড়া ভাঙতে পারিনি। তিনি আমার কাছে larger than life, যাকে admire করা যায় কিন্তু কাছে যাওয়া যায় না। ফেরার পথে এক রাজনৈতিক কর্মী বন্ধুকে জিগ্যেস করলাম- "ভদ্রলোকের নাম জানিস?"। সেই জানলাম তাঁর নাম অমিতাভ বসু। ভেতরে কিছু শব্দবন্ধ অস্ফুট রয়ে গেল- towering personality.

[এরপর আলকাপে যাওয়া বেড়ে গেল। প্রতি দ্বিতীয় শনিবার নাটকের শো দেখতে শুরু করলাম। সব কিছুর মাঝে আলকাপের সেই আলো আঁধারী মহলাকঙ্কের পিছনে বসে দেখতাম- a lion is ruling the stage with all its grace.

এরপর জীবন ও যাপনের গুঁতো ও খোঁচা খেতে খেতে, বহুবার বাসা বদলাতে বদলাতে প্রায় সারা শহর পরিক্রমা করে মালঞ্চতে সাময়িক স্থিত হয়েছি। সেখানে লাল বাংলাতে আমাদের আড্ডা। বেশ জমিয়ে বসেছি আমি। একটি দেওয়াল পত্রিকাও শুরু হয়েছে। সাইরেন। আড্ডায় নিয়মিত যোগ দি। ভালোই কাটছে দিন। আলকাপে আর বিশেষ যাওয়া হয়না। জীবন কখন যেন গলায় একটা বকলস পরিয়ে দিয়েছে। আমিও মেনে নিয়েছি।]

দৃশ্য ২

শীতের ছুটির দিন। সাইরেনের আড্ডায় বসে আছি। চমকে উঠলাম। তিনি কিটুদার সাথে, তিনি কথা বলছেন। রাজনৈতিক কর্মী ডি কিটু। কান দুটোকে বাড়িয়ে দিলাম।। কি কথা হচ্ছে? উদ্দেশ্য- যদি আলোচনায় নিজেকে গলিয়ে দেওয়া। সুযোগ এসে গেল। তিনি কিটুদার কাছে মার্কেজের লেখার বাংলা অনুবাদ নিয়ে জানতে চাইছেন। কিটুদাই ডেকে নিলেন। পরিচয়টা করিয়ে দিলেন। ভেতরে কোথাও মিহি শব্দ করে অনেক ফুল ফুটে উঠল। কলকাতার কোথাও তাঁকে মার্কেজের ছোটোগল্প বিষয়ে বলতে বলেছে। তাই তিনি মার্কেজের লেখার বাংলা অনুবাদ সম্পর্কে জানতে চাইছেন। কথা হোল অনেকক্ষণ। তিনি চলে গেলেন। আলাপটা অবশেষে হয়ে গেল। তিনি আবার তাঁর ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের চোরাবালিতে ডুবিয়ে দিয়ে গেলেন।

[মাঝে অনেক সময় কেটে গেছে। প্রায় দশ বছর। অনেক ধুলো বালি পরিয়ানী হয়ে দেশ বিদেশে হারিয়ে গেছে। আমার গলায় বকলস আরো জোরে চেপে বসেছে। ন-মাসে ছ-মাসে একবার আলকাপ যাই। তাঁর সাথে মাঝে মাঝে দেখা হয়। কথা হয়না। হাসি বিনিময় হয়। তিনি মুক্ততার পেলব পালক ছড়িয়ে যান। এর মাঝে পারম্পরিক বন্ধুদের কাছ থেকে জেনেছি তাঁর জীবনের শিলাবৃষ্টি ও আগুন। এটাও জেনেছি তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে শাসন করেছেন বড় ও আগুনকে।

২০১৪ পরবর্তী ভারতবর্ষে আমাদের জীবন পালে গেল। করোনা তখনো আসেনি। কিছুদিন পর আসবে। সামাজিক রাজনৈতিক উথালপাতালের সাথে জুড়ে যাবে জীবন মরণের শঙ্কা। রাজনৈতিক সামাজিক ও ব্যক্তিগত উথালপাতালের মাঝে বন্ধুরা মিলে ঠিক করি একটি পত্রিকা বের করার যাতে সময়ের ইতিহাসকে অন্য পরিসরে মূর্ত করা যায়। টিউয়ের সাথে পরিচয় ঘন হোল। টিউ, আলকাপের অভীক। ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনের আগে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। সেই পূর্ব পরিচিত চোখের ধুলো। যুদ্ধের থেকে সাধারণ মানুষ কি পায়? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে, এই নিয়ে একটি সংখ্যা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অমিতাভদা লিখতে রাজি হন।]

দৃশ্য ৩

একদিন ফোন করলেন। লেখা হয়ে গেছে। আমি যেন লেখাটি নিয়ে নি। আই আই টি ফ্লাইওভারের ওপর দেখা করার কথা হোল। দেখা হোল। তিনি লেখা দিলেন। আমরা কথা বললাম যুদ্ধ নিয়ে, সমসাময়িক

রাজনীতি নিয়ে, আমাদের ভয় নিয়ে। কথার মাঝে উঠে এলেন ফারনান্দো আরাবেল, বাদল সরকার। যা তাঁর লেখার বিষয়। কথায় কথায় জানতে পারলাম তাঁর শরীর ভাল নেই। হিমোগ্লোবিন কমে গেছে ভয়ানকভাবে। সুগারও বেড়েছে। চিকিৎসা শুরু হয়েছে। এই প্রথম যেন ক্লান্তি দেখলাম। যাওয়ার সময় ডেকে গেলেন – ‘ঘরে এসো একদিন, জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে’। [এবারে দৃশ্যপট খুব দ্রুত ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে]

দৃশ্য ৪

খড়গপুর বইমেলায় মাঠে আমাদের আড্ডা হচ্ছে। আমি ও অমিতাভদা কথা বলছি নিবিড়ভাবে। এই মানুষটির এত কাছে আসতে পারবো ভাবিনি কোনোদিন। বললাম- অমিতেশ মাইতির কবিতাসংগ্রহের প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়েছে। চোখদুটো তাঁর ঝিলিক দিয়ে উঠল। কবি অমিতেশ মাইতি তাঁর খুব বন্ধু ছিলেন। তাঁরা একসাথে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। বললেন- অমিতেশ অসাধারণ লিখতো। কি যে হলো, অসময়ে চলে গেল।

[প্রস্তাব দিয়েছিলেন অমিতেশ মাইতির কবিতার আলোচনা লেখার। সানন্দে রাজি হয়েছিলেন। না, সে আলোচনা আর লিখিত হবে না। মৃত্যুর পরে আর কিছু থাকেনা। তবুও ভাবতে ভালো লাগে যে দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধু মিলে কবিতার আলোচনায় মশগুল হয়ে আছেন]

দৃশ্য ৫

আই আই টি টেক মার্কেট গেছি। সাথে ফালুদা। ফালুদা ঘোষ, পারচমেন প্রকাশনীর কর্ণধার। উদ্দেশ্য, ফালুদাকে হিজলি জেল দেখানো ও টেক মার্কেটের বই ব্যবসায়ীরা কেমন আছেন তা একটু খোঁজখবর করা। হঠাৎ অমিতাভদার সাথে দেখা। বই-এর পাঠক কমে যাওয়া, মোবাইলের দাপট, পাঠ্যসূচির বাইরের বইয়ের বিক্রি না হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা অনেকক্ষণই ঘুরপাক খেল। তিনি বললেন, আমরা শুনলাম। যাওয়ার সময় আবার বলে গেলেন, ‘ঘরে এসো, জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে’।

দৃশ্য ৬

আলকাপের মাসিক নাট্যানুষ্ঠান। চেনা আখুলির নাটকের পরে আরো অনেকের সাথে আমিও আড্ডায়। অমিতাভদা মধ্যমণি। হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, “পত্রিকার কি হল?” আমি সংকুচিত। অনেকগুলি লেখা নেওয়া হয়েছে। পত্রিকার কোনো সংখ্যা প্রকাশ করা যায়নি। বললাম, “কিছু আভ্যন্তরীণ সমস্যা ছিল, তা প্রায় কেটে গেছে, এবার প্রকাশিত হবে”। তিনি বললেন, “আমি

সমস্যাগুলো জানি। এটা হয়তো হওয়ার ছিল।
যাইহোক, এটা নিয়ে পরে কথা হবে"।

[দিন কাটছে নিজের মতো। মাঝে খবর পেয়েছি, তাঁর
চিকিৎসা ভালোই চলেছে। ওষুধ প্রয়োগের পর তা
কাজও দিয়েছে। হিমোগ্লোবিন, প্লেটলেট আশানুরূপ
ভাবে বেড়েছে। মাঝখানে একবার ফোনে কথা হলো,
বললেন, রাজস্থান যাচ্ছেন। সব কিছু ছন্দে ফিরছে।
বেশ, বেশ ভালো লাগলো।]

দৃশ্য ৭

টিউয়ের ফোন। অমিতাভদা কোমায়। পিয়ারলেস
হাসপাতালে ভর্তি। সব কিছুই যেন ওলট পালট হয়ে
গেল। সবই তো ঠিক ছিল। কি হলো? কেন হলো? না
কোনো প্রশ্নের উত্তর নেই। এই প্রশ্নগুলি চিরন্তন-
উত্তরহীন।

টিউয়েরকাছ থেকেই খবর নি। কেমন আছেন? কখনো
রোদ ওঠে, আবার সাথে সাথে মেঘলা হয়ে যায়। এক
অনন্তকালীন অপেক্ষা। আশা ও নিরাশার।

দৃশ্য ৮

কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরছি। ট্রেনটি খড়গপুর সেশনে
চুকছে। ভিড় ঠেলে নামছি, ফোন বাজছে। যেন
আর্তনাদ করছে। রিসিভ করলাম। ওপারে বানুদার
গলা। অমিতাভের দেহ আলকাপে নিয়ে আসা হচ্ছে।
তুমি চলে এসো। একজন মানুষ কিভাবে হঠাৎ করেই
ক্ষণিকের ব্যবধানে দেহ হয়ে যায়। কি বিচিত্র এই
জীবন।

[সেশনের বাইরে বেরিয়ে তিনটি গোলাপ কিনলাম।
আমার শেষ অর্ঘ্য। আর তো কিছুই দেওয়ার নেই।
আরো অনেক কথা বলার ছিল। শোনার ছিল তার
চেয়েও বেশি। না, আর আড্ডা হবে না। যে
আলোচনাগুলো পরে হবে বলে তোলা ছিল, সেগুলো
অসমাপ্তই রয়ে গেল। তখনো তাঁর লেখাটি প্রকাশ করা
যায়নি। এ অপরাধবোধ চিরকাল রয়ে যাবে।]

দৃশ্য ৯

আলকাপের সামনে হাজির হলাম। বেশ ভিড়। পরাবাস্তব
নীরবতা। অনেকে এসেছেন। অনেকে আসছেন। অনেকে
আসবেন। প্রিয় মানুষটিকে শেষবার দেখা। মহলাকক্ষের
মাঝে একটি উত্তীর্ণ বেদী। তার ওপরে সবটা জুড়ে
আলকাপ লেখা। চারিদিকে ফুল ছড়ানো। অনুভূতি
ছটানো। অশ্রু ছড়ানো। ঘরের ছেলের শেষবার ঘরে
ফেরা। প্রকৃত অর্থে আলকাপই অমিতাভদার ঘর। সেই
উপাসনালয় যেখানে তিনি শান্তি পেতেন। যেখানে তিনি
বলপেতেন সমস্ত ঝড় ও আগুনকে শাসন করার।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি সম্পর্কিত কয়েকটি সংশয়ের নিরসনের বাসনা নিয়ে এ চিঠি লেখা। প্রথমেই জানাই এ সম্পর্কে আমার নিজস্ব জ্ঞান স্বল্পই। বিশেষতঃ এই শিল্প মাধ্যমটির উপর আমার কোন দখল আদৌ জন্মায়নি। আমি কেবলমাত্র অন্তরের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে ‘আবৃত্তি’ করার চেষ্টা করি, এইটুকুই যা। সেগুলো অধিকাংশই কোন মানেই উত্তীর্ণ হয়না, অতএব আমার যা কিছু নিবেদন এই চিঠিতে সবই এক অর্বাচীনের এবং সেখানে লেগে থাকবে অনেক কাঁচামাটির ছাপ—এটুকু মনে করে অগ্রিম ক্ষমাপ্রার্থনা করে রাখলাম। আরো বলি, হয়তো বা বেশ কিছুটা দুঃসাহসে ভর দিয়ে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনার চেষ্টা চালাচ্ছি। কেবলমাত্র জানার বাসনা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য এখানে নেই।

‘কবিতা পাঠ’ ও ‘আবৃত্তি’ দুটি মোটামুটি একই শিল্প মাধ্যমের ভিন্নতর দুটি রূপ বলেই মনে করি। এদের মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আমাদের অর্থাৎ বর্তমান প্রজন্মের ধারণায় সেই পার্থক্যটি কেবলমাত্র স্মৃতিশক্তি সম্পর্কিত নয় বলেই মনে হয়। যদিও অভিজ্ঞ অনেকেই এমন মতামত দেন যে স্মৃতিনির্ভর হলেই ‘আবৃত্তি’ এবং বইটি খোলা থাকলেই তা ‘কবিতা পাঠ’। কিন্তু এ মতামতের মধ্যে অনেক কথা থেকে যায় যা অনুচ্চারিত। আমরা তো জানি ‘আবৃত্তি’ শব্দটির ব্যুৎপত্তিমূলতঃ ‘আবৃত্ত’ শব্দ থেকেই যার অর্থ পুনঃ পুনঃ পাঠ করা অর্থাৎ প্রাচীনকালে কোন লিখিত লিপি না থাকায় গুরু-শিষ্য পরম্পরায় এই পদ্ধতিতেই পাঠ দানটি প্রচলিত ছিল এবং পাছে একবার শ্রুত হওয়া মাত্রই অর্থটি সম্পূর্ণ বোঝা না যায় সেই কারণেই বারংবার উচ্চারণের এই প্রচলন। এবং আবৃত্তির উৎস ভূমিটি সেই সুপ্রাচীন বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যেই নিহিত। তখন তো বেদেরই অপর নাম ছিল ‘শ্রুতি’। এই শ্রবণ নির্ভরতাই আবৃত্তিকে স্মৃতি নির্ভর করার একমাত্র কারণ। মাননীয়, এসবই আপনার জানা তথ্য। কিন্তু আমার মূল প্রতিপাদ্যটি অন্য। বেদের কালে কেবলমাত্র লিখিত পুঁথির অভাব থাকার দরুণ যে স্মৃতিনির্ভরতা ছিল আবশ্যিক শর্ত (কোন বিকল্প না থাকায়) আজও তা কতটা আবশ্যিক বলে মনে হয়? তবে বৈদিক যুগের পরেও বহুদিন, এমনকি হালফিল সময়ের পূর্বে পর্যন্তও ‘আবৃত্তি’ বলতেই অনিবার্যভাবেই স্মৃতিনির্ভরতা চলে আসত। তিরিশের দশকের পর থেকেই ক্রমশঃ কবিতায় জটিলতা বেড়েই চলে, ফলে কবিতা ও পাঠকের মধ্যে একটি দূরত্ব তৈরি হতে শুরু করল। তাই কবিতা পাঠের দায়িত্ব

সবাই অপেক্ষারত। ঘণ্টা তিনেক কেটে গেছে। আলকাপ জেনে গেছে ছেলে ঘরে নাও ফিরতে পারে। মাঝখানে বাধা হয়েছে সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তিবোধ। যুদ্ধ বেধেছে পার্থিব শরীরের অধিকার নিয়ে। সেই যুদ্ধ যার বিরুদ্ধে তিনি তাঁর শেষ লেখাটি লিখে গেছেন। সেই যুদ্ধ, যার ফল সবসময়ই শূন্য।

অবশেষে পরিষ্কার হয়ে গেল তাঁর পার্থিব দেহ আলকাপে আসবে না। অঝোরে কেঁদে ফেললেন দেবদাসদা। আলকাপের প্রবীণ সদস্য দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ছেলে ঘরে ফিরল না। সত্যিই কি তাই। আমি দেখলাম ভাঙা ভিড়ের মাঝখানে তিনি এসেছেন। দেবদাসদার পাশেই বসেছেন। সেই ব্যক্তিত্ব, সেই পৌরুষ, সেই মোহিনী হাসি। বলছেন, আমি মুক্ত আজ, ফিরে এসেছি আমার প্রকৃত ঘরে, কেউ আটকাতে পারেনি।

কিছুক্ষণ পরে তিনি মিশে যাচ্ছেন প্রকৃতির সাথে। আমি দেখতে পাচ্ছি, The Lion is tired, but not defeated and he is whipping the storm and the fire with his inherent grace.

থাকে। যদিও আবৃত্তিকার তা তিনি দেখেই করুন বা না দেখেই করুন তাঁর দায়িত্ব একটু বেশিই। জনসাধারণের সাথে সংযোগ সেতু তৈরি করার বৃহত্তর দায়িত্ব তাঁকে modulation, নাট্যধর্মিতা ইত্যাদি আয়ুখে সজ্জিত করে। উপরন্তু তাঁর উপর দায়িত্ব থাকে কবিতাটিকে যথাযথ সততার সাথে শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেওয়া। কাজটি বিশেষভাবেই কঠিন। কঠিন বলেই অনেক আবৃত্তিকার কবির কণ্ঠস্বরকে ছাপিয়েও কবিতাটিকে জনপ্রিয় করার তাগিদেই অতিরিক্ত নাটকীয়তা আরোপ করছেন। এব্যাপারে কবির ক্ষেপে লাল। অনেকেই বলছেন ‘আমাদের কবিতা আবৃত্তিকারেরা মাটি করছেন’ (সুনীল শক্তি-র নাম এব্যাপারে উল্লেখ্য)। সত্যিই, শ্রুতি নাটকের কিছু কলাকুশলী এসেছেন যাঁরা না বোঝেন ছন্দ, না বোঝেন শব্দ, বোঝেন কেবল নাটকীয়তার geemic। অবশ্যই নাটকীয়তা থাকবে, কিন্তু তা হবে আনুপাতিক (এ প্রসঙ্গে শব্দ মিত্র বা প্রদীপ ঘোষ আমার স্মরণযোগ্য)। শরৎ মুখোপাধ্যায় উপরোক্ত সেমিনারে বলেছিলেন “আমাদের কবিতা আমরা পড়তে চাই, আত্মগত, মৃদু উচ্চারণে কেননা lyrical subjectivity এতেই রক্ষিত হয়..... অথচ আবৃত্তিকারেরা করেন চড়া সুরে এতে কবিতার হানি হয় ইচ্ছে হচ্ছিল উঠে প্রশ্ন করি ‘বিদ্রোহী’ বা ‘দেবতার গ্রাস’ – এর মত কবিতা কী একই ভাবে পড়া শোভন বা বাঞ্ছনীয়? অথচ একদিন বরং মালামের মত কবি ভালেরীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন যে ভালেরীর মৃদু কণ্ঠস্বরে তার কবিতার হানি হয়। (দ্রঃ - উপরোক্ত প্রবন্ধ / শঙ্খ ঘোষ)।

কবিতাপাঠ ও আবৃত্তির এ লড়াই চলছে আবার সমঝোতার পথও বেরুচ্ছে। ‘আবৃত্তি অকাদেমী’-র বাল্মীকি পত্রিকায় সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত (কবি) উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন “আবৃত্তি ও কবিতাপাঠের তফাৎ আছে। তবে যোগ্য মনন ও শিক্ষা থাকলে আবৃত্তি কবিতাপাঠের অঙ্গঙ্গী হয়ে যেতে পারে। তবে আবৃত্তি স্মৃতি থেকে করতে পারলেই ভালো।” লক্ষণীয় ‘ভালো’ বলেছেন কিন্তু বলেননি এটি আবশ্যিক বা কবিতাপাঠ ও আবৃত্তির এটিই একমাত্র পার্থক্য তাও বলেননি। শব্দ মিত্র স্বয়ং স্মৃতির প্রায় গোড়া সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও তিনিও বলেছেন বই দেখে পড়লেই কবিতাপাঠ না দেখে পড়লেই আবৃত্তি এ মতটি ঠিক নয়। (দ্রঃ - অভিনয় নাটক মঞ্চ) এছাড়া আমি নিজে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি A.I.R.-এ ‘আবৃত্তি’র অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণতঃই script দেখে আবৃত্তি করতে বলা হয়। যুববাণী-তে তো মাত্র দুদিন rehears করতে দেওয়া হয় — সেক্ষেত্রে মুখস্থের কোন প্রশ্ন ওঠেই না। Audition-এও

বর্তাল কবিদের উচ্চারণের ওপর অনেকটাই। কবিদের ক্ষেত্রেও অনেকটা সচেতনতা এল। তাদের উচ্চারণে, বিশেষ একটি লাইনের এমনকি প্রয়োজনে একাধিকবার উচ্চারণের নজিরও পাওয়া যায় হালফিলে। উদাহরণ স্বরূপ বলি, বিনয় মজুমদার কোন একটা কবিতা পড়তে গিয়ে থেমে একটি শব্দকে একাধিকবার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উচ্চারণ করছেন ——— এমন উল্লেখ আমরা পাই শঙ্খ ঘোষের ‘নিঃশব্দের তর্জনী’ গ্রন্থে। (প্রবন্ধঃ ‘কবিতাপাঠঃ কথা ও সুর’) যদি আবৃত্তিকারকে এমনভাবে কবিতাটিকে সংবেদ্য করতে হয় তবে, আবৃত্তির দফারফা হয়ে যাবে, কোন সন্দেহ নেই। এই একটি উদাহরণের সাহায্যেই আমরা বোধ হয় বুঝে নিতে পারি ‘আবৃত্তি’ ও ‘কবিতাপাঠ’-এর (যা সচরাচর কবিরা নিজেই করেন) মধ্যে প্রভেদ অন্যত্র, কেবলমাত্র স্মৃতিনির্ভরতায় নয়।

সচরাচর কবিরা নিজেই নিজের কবিতা পাঠ করার চেষ্টা করেন। সবাই যে ভালো পারেন তাও নয়। শুনেছি জীবনানন্দ দাশ কবিতা পড়তে পারতেন না আদৌ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা পাঠও শুনেছি — আদৌ ভালো নয়। সাম্প্রতিক কালে শুনলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়ের কবিতা পাঠ। তাও তেমন ভালো লাগেনি। ভালো লেগে যায় — নীরেন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ, শঙ্খ ঘোষের এবং বিশেষতঃ বিষ্ণু দে-র ভরাট কণ্ঠস্বরের কবিতা পাঠ। শক্তির কবিতা শক্তি ছাড়া অন্য কেও ভালো পড়তে বা আবৃত্তি করতে পারেন না এরকম একটি প্রবাদই চালু আছে। (বিকাশ রায়ও একদা এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন শক্তির ‘অবনী বাড়ী আছে’ আবৃত্তিকালে।) অর্থাৎ এ সব প্রসঙ্গ থেকে এ বিষয়টি ক্রমশঃ ইম্পট। কবিদের কবিতা পাঠে যতখানি স্বাচ্ছন্দ্য তা বোধ হয় আবৃত্তিকারের নয়। কবিদের ক্ষেত্রে কবিতা পাঠে তারা প্রয়োজনে অনেকটাই স্বাধীনতা গ্রহণ করেন। যেমন দেখা গেল বিনয় মজুমদারের উদাহরণটিতে ...) বৃহত্তর পাঠকমন্ডলীর (যাদের অনেকেই কবিতার পাঠেও এমনকী অভ্যস্ত নন) সাথে যোগাযোগের বা communication করার দায়টা সম্ভবত পাঠের মধ্যে কম থাকে বলেই হয়ত কণ্ঠস্বর এমনকি উচ্চারণ ভালো না হলেও পাঠ উতরে যায়। এছাড়া পাঠের মধ্যে থাকে একটি নিরাবেগ বা কেমন একধরনের detachment। বিশেষ শব্দের উপর ঝাঁক দিয়ে, থেমে যে প্রকরণে তাঁরা পড়েন তাতে মনে হয় নিজের অনুভূতিকেই তিনি নিজে খুঁড়ে চলেছেন অনেকটা আত্মগত সুরেই তাঁরা পড়েন। সেখানে যেন ব্যবচ্ছেদ বা dissection এর মত একটি সতর্ক অন্বেষণ

এমন কোন নিয়ম নেই। বস্তুতঃ দেখে বললে শ্রোতার কোন অসুবিধা হয় না — কিন্তু শ্রোতা যখন দর্শকও তখন যেন কোথায় সংস্কারে বাঁধে। কেউ বলছেন involvement ঠিক হয়না। আমাদের ধারণা, এটি ব্যক্তিভেদে বদলে যায়। আবৃত্তির প্রকরণ অনেক বদলে গেছে। এক কালে তো হাত-পা নেড়ে আবৃত্তি হত, আজ তা হাস্যকর। আবার কোন চড়া সুরের কবিতায় স্বভাবতঃই কিছুটা হাতের movement হয়ে যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে কোন অনুশাসন নেই তখন স্মৃতির ক্ষেত্রেও কোন অনুশাসন থাকা কতটা জরুরী? বিখ্যাত কবি শামসুর রহমান এ প্রসঙ্গে ঠিকই বলেছেন : "মুখস্থ বলাই ভালো, দেখে দেখে পড়লে অনেক সময় আটকে যায়অনেক সময় শ্রোতাদের কাছে কমিউনিকেট করা যায় না,
তবে আবশ্যকতা আছেই তা-ও নয়, কেউ কেউ দেখেও খুবই ভালো পড়েন। (দ্রঃ -ছন্দনীড় ১৩৯২ শ্রাবণ, পৃষ্ঠা ১৬)। স্বয়ং প্রদীপ ঘোষ বা রম্মা মিত্রকেও প্রয়োজনে বই দেখে অনবদ্য আবৃত্তি করতে শুনেছি।

আমি নিজে খুবই বাজে আবৃত্তি করি। অতএব এ অর্বাচীনের চিন্তায় কোন খামতি থাকলে শোখনযোগ্য। আপনি বললে আমি মুখস্থ করে ঐ দিন আবৃত্তি করতে বাধ্য। কিন্তু কয়েকটি মৌল প্রশ্ন আজ যখন উঠে পড়েছে তখন তা না জানালে নিজের বিবেকের কাছে অপরাধী থাকবো। আমাকে ক্ষমা করবেন কোন ত্রুটি থাকলে।

বিনীত

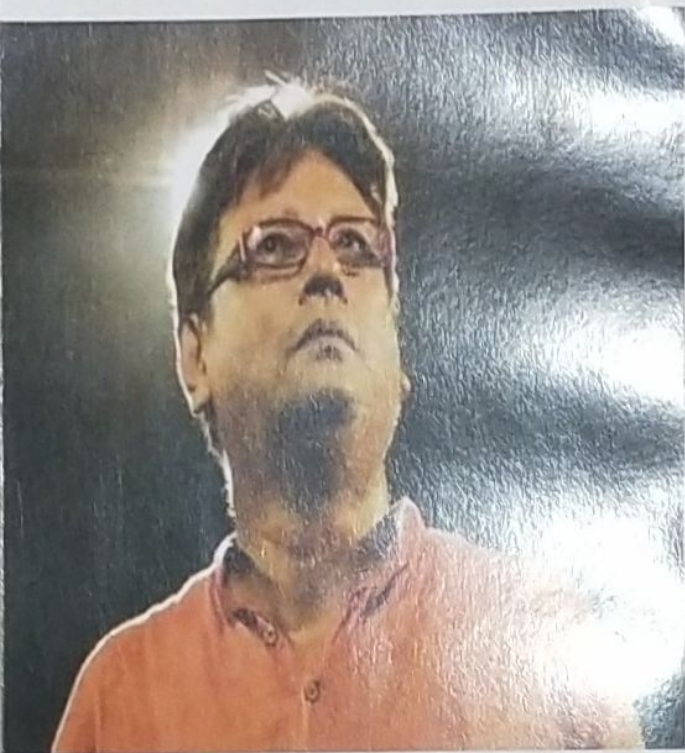
B. Ed. Department

-অমিতাভ বসু

Panskura

পুনশ্চঃ আমি অবশ্যই একথা স্বীকার করি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্মৃতিনির্ভরতার সপক্ষে মতামত গেছে।

(অমিতাভ বসু লিখিত একটি চিঠি 'কবিতা ও আবৃত্তি বিষয়ক একটি সুচিন্তিত আলোচনা'। লেখার তারিখ ও কাকে লেখা তা জানা যায়নি)



শর্ট ফিল্ম - ব্যাক স্টেজ